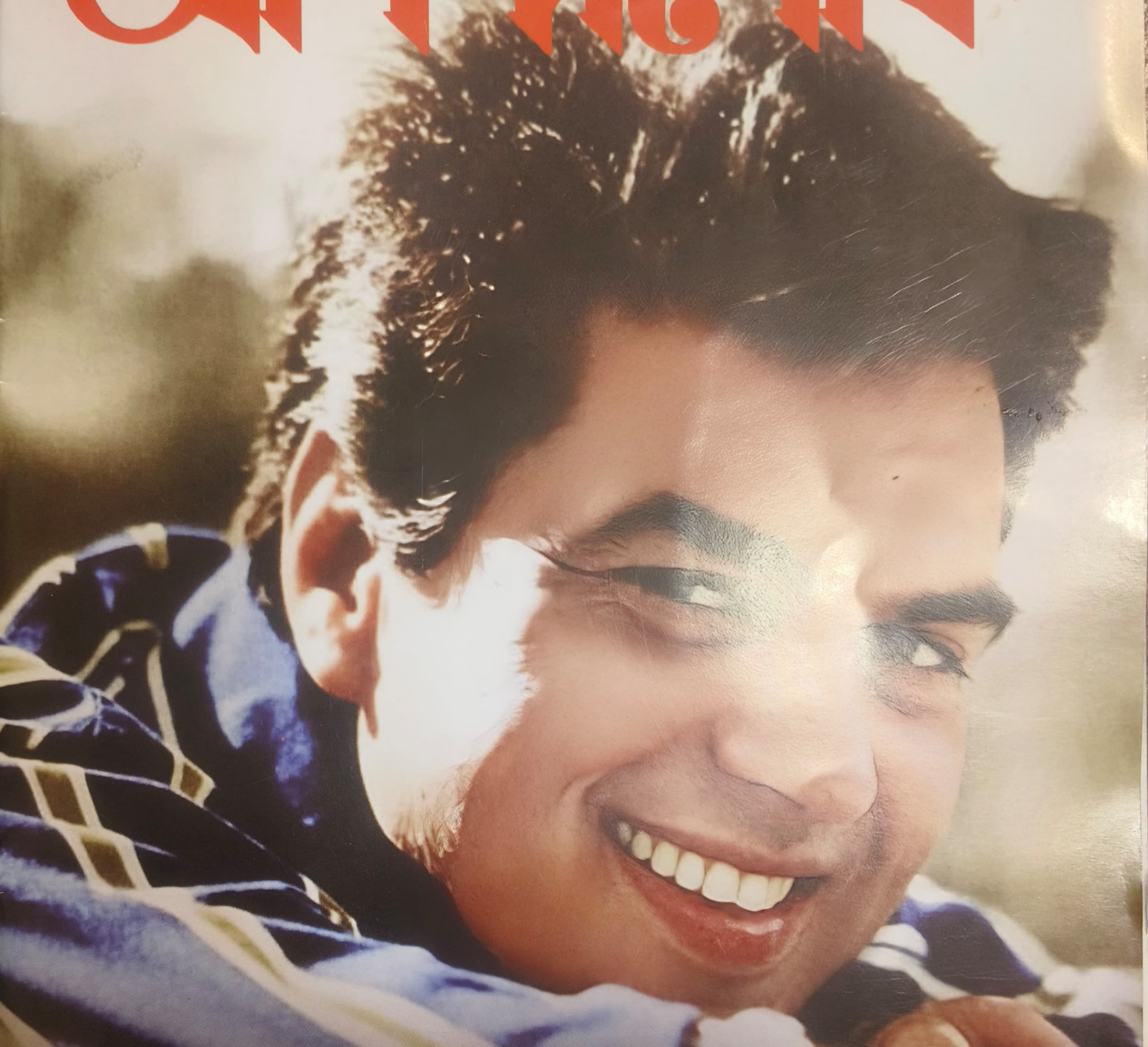
১২ ডিসেম্বর ২০২৫

আনন্দলোক



ধরম সিংহ দেওল

৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫- ২৪ নভেম্বর ২০২৫

শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন

শর্মিলা ঠাকুর ● বিশ্বজিৎ ● আশা পারেখ ● শত্রুঘ্ন সিনহা

সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, নানা স্বাদের প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, বিতর্ক, আইনি জটিলতা ও বিরল ছবি

আনন্দলোক কোথায় কী
৫১ বর্ষ ২২ সংখ্যা ১২ ডিসেম্বর ২০২৫



স্মরণে ধর্মেন্দ্র

বলিউডের হি-ম্যান তিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছেন নিজেকে। ধর্মেন্দ্রর জীবন উদ্‌যাপন করা হল আনন্দলোক-এর সম্পূর্ণ সংখ্যায়। দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, বিরল ছবি, নানা স্বাদের প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা দিয়ে

প্রচ্ছদ: ধর্মেন্দ্র

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

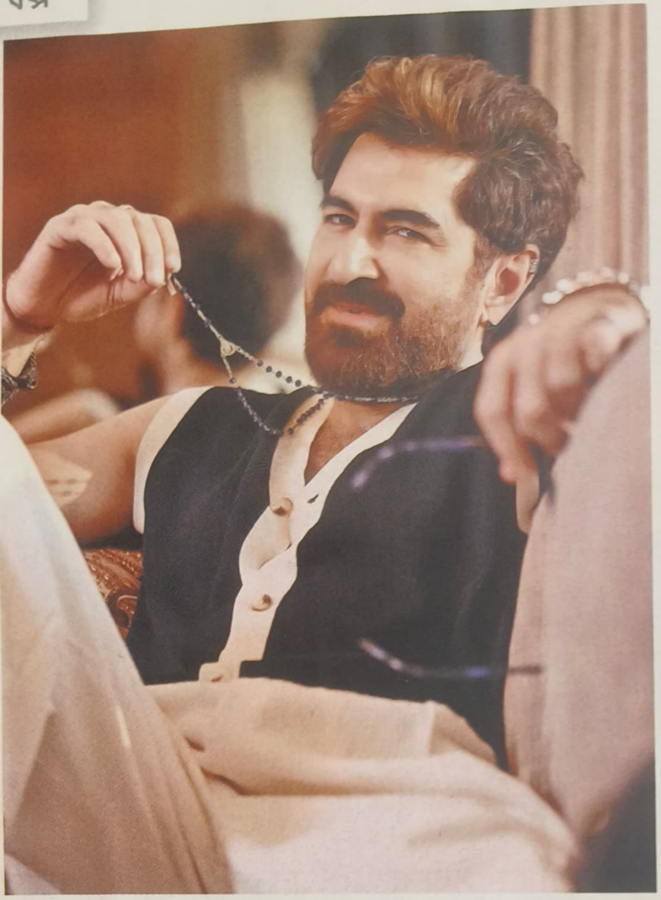
মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 22nd
RNI Regd No. 27039/74

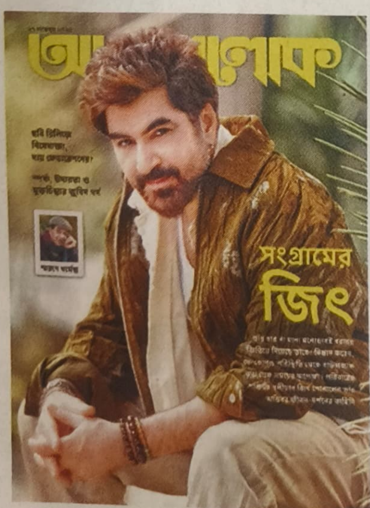


■ জিৎ

অপরাজিত জিৎ

আনন্দলোকের ২৭ নভেম্বর সংখ্যায় প্রিয় তারকা জিতের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার জীবন-দর্শনের অন্য সংজ্ঞা দিল। সময়ের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজি বদলানো, নিজের চেয়েও বেশি ইন্ডাস্ট্রির উপর বিশ্বাস রাখা, মিথ্যে বলতে খারাপ লাগার কারণে ছবির প্রিমিয়ারে না যাওয়া, প্রচারের চেয়েও বেশি ছবির কনটেন্টে জোর দেওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে একা মেনস্ট্রিম বাংলা ছবিকে ধরে রাখা... এগুলোই ব্যক্তি জিৎ-কে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে। তাঁর প্রতি সম্মান বাড়ল।

নীলেশ নন্দী, মধ্যমগ্রাম



অনুপ্রাণিত করল

জিৎ-এর সাক্ষাৎকারের প্রতিটি কথা খুবই মনোগ্রাহী। জিৎ-এর জন্মদিনের ঠিক তিন দিন আগে জিৎ প্রেমীদের কাছে সেরা উপহার এটাই। সংগ্রাম না করলে জীবনে বড় হওয়া যায় না, এটা তারই প্রমাণ। জিৎ-এর এই সাক্ষাৎকার জীবনে বড় হতে অনুপ্রাণিত করবে। জিৎ আরও সাফল্য পাক, এই আশা রাখি।

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ি

স্যালুট জানাই

আনন্দলোকের ২৭ নভেম্বরের সংখ্যায় স্পোর্টস বিভাগে দৃষ্টিহীন মহিলা খেলোয়াড়দের খবরটি মন জয় করে নিল। অনেক দৈনিক পত্রিকা দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেটারদের জয়ের খবরটি উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু আনন্দলোক যোগ্য সম্মান দিয়েছে। হ্যাটস অফ আনন্দলোক, স্যালুট জানাই দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেটারদের।

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ি

শতবর্ষে সলিল

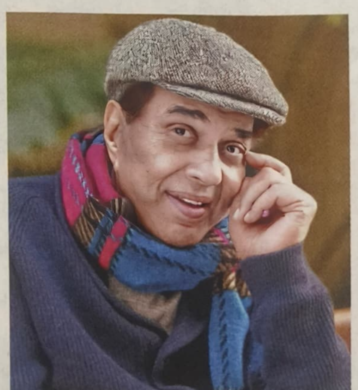
আনন্দলোকের সলিল স্মরণ সংখ্যায় যাঁরা যাঁরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন, তাঁদের মারফত অনেক অজানা তথ্য জানলাম। সেই জন্য আনন্দলোককে অনেক ধন্যবাদ জানাব। কিন্তু আমার আক্ষেপ, বইতে সলিল চৌধুরীর জীবনপঞ্জি দেখতে পেলাম না। আমার অনুরোধ যদি অন্য কোনও সংখ্যায় তাঁর জীবনপঞ্জি প্রকাশ করেন, বাধিত হব।

দুলাল চন্দ্র দাস, বেহালা

আশায় রইলাম

ধর্মেন্দ্র মারা যাওয়ার পর আনন্দলোকের ২৭ নভেম্বর সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। কিন্তু মাত্র দু'পাতার স্মরণ! এটা আনন্দলোকের কাছে একেবারেই কাম্য নয়। আশা রাখব, পরবর্তী সংখ্যায় তাঁকে নিয়ে একটি স্মরণ সংখ্যা অবশ্যই আসবে।

দিব্যেন্দু ঘোষাল, যাদবপুর



■ ধর্মেন্দ্র



■ দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেট দল



■ সলিল চৌধুরী

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

নায়ক চরিত্রের পুনর্নির্মাণে ব্যতিক্রমী সত্তা

বলিউডের ‘হি ম্যান’ হলেও **ধর্মেন্দ্র**র যোদ্ধা চরিত্রের ব্যাপ্তি ও বহুমুখিতা অনেকখানি। এমন এক অভিনেতা, যিনি নিজেকে সময়ের সঙ্গে বদলে নিতে শিখেছিলেন। লিখছেন পায়েল সেনগুপ্ত



হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে কিছু অভিনেতা শুধু পর্দার চরিত্রে সীমাবদ্ধ থাকেননি—তাঁরা এক একটি যুগ, এক একটি পৌরাণিক প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছেন। ধর্মেন্দ্র সেই বিরল অভিনেতাদের একজন, যিনি পাঁচের দশকের শেষ সময় থেকে আটের দশক পর্যন্ত বলিউডের নায়কত্বের মানে বদলে দিয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল—“The He-Man of Hindi Cinema।” কিন্তু এই ‘হি-ম্যান’ ইমেজ তৈরি হয়েছিল কেবল শরীরের শক্তি দিয়ে নয়, বরং এক জটিল মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। তাঁর কেরিয়ারের যাত্রাপথ মানেই বলিউডের বাণিজ্যিক ছবির ইতিহাসের প্রতিফলন। ধর্মেন্দ্র কেবল এক প্রজন্মের রোম্যান্টিক নায়কই নন, বরং এমন এক অভিনেতা, যিনি নিজেকে সময়ের সঙ্গে বদলে নিতে শিখেছিলেন। রোম্যান্স থেকে অ্যাকশন, সংবেদনশীলতা থেকে বীরত্ব, সব জায়গায় তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। ভালবাসা, সাহস, আর পুরুষালি আকর্ষণের প্রতীক হিসেবে তাঁকে মনে রাখবে দর্শক ও সিনেমাপ্রেমীরা। কিন্তু তাঁর এই রূপান্তর একদিনে আসেনি। এটি এক দীর্ঘ, সচেতন যাত্রা, যার ভিতর রয়েছে দর্শকের রুচির পরিবর্তন, সমাজের মানসিকতার বিবর্তন, এবং এক শিল্পীর নিজের আত্মসন্ধান।

চলচ্চিত্রে নিজের ইমেজ তৈরি

ধর্মেন্দ্রর জন্ম ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা এক সাধারণ তরুণ হিসেবে তিনি কখনও ভাবেননি যে একদিন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক হবেন। তবে ছোট থেকেই মুভিতে মুগ্ধ ছিলেন তিনি। একটি বিশেষ চলচ্চিত্র পত্রিকার নতুন মুখের সন্ধান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে তিনি মুম্বই আসেন। গ্রামের ছেলে থেকে মুম্বইয়ের পর্দায় আসার গল্প শুরু হয় এখান থেকেই। তাঁর প্রথম দিকের ছবি ‘দিল ভি তেরা হম ভি তেরে’ (১৯৬০) ছবিতে তাঁকে খুব একটা আলোচনায় আনেননি কেউই। কিন্তু ধীরে ধীরে ‘বন্দিনী’ (১৯৬৩), ‘আনপড়’ (১৯৬২) বা ‘হকীকত’ (১৯৬৪)-এর মতো ছবিতে তিনি সংবেদনশীল, স্থির এবং আবেগময় চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের নজরে আসেন। ছোটবেলা থেকেই সিনেমায় মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রিয় অভিনেতা ছিলেন দিলীপ কুমার—যাঁর সংবেদনশীল



অভিনয় আর আবেগময় চোখ ধর্মেন্দ্রর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। প্রথমদিকে ধর্মেন্দ্রর ইমেজ ছিল এক স্নেহময়, সংযত নায়কের—যিনি ভালোবাসেন, কিন্তু তা কখনও চিৎকার করে জানান না। 'অনুপমা' (১৯৬৬) ছবিতে তাঁর নিঃশব্দ ভালোবাসা আর কবিত্বপূর্ণ উপস্থিতি তাঁকে 'রোম্যান্টিক সংযম'-এর প্রতীক করে তোলে। এই ছবিগুলোয় তিনি ছিলেন নম্র, শান্ত, সংবেদনশীল এক তরুণ—যে প্রেম করে, ত্যাগ করে, এবং ভালোবাসার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। তাঁর অভিনয়ে ছিল একটা কোমলতা ও সৌন্দর্য, যা দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। সেই সময়ের রোম্যান্টিক হিরোদের ভিড়ে ধর্মেন্দ্র ছিলেন স্বাভাবিক, সৎ এবং নিরাভরণ। তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে তখন সংবাদপত্রে লেখা হত—"ধর্মেন্দ্র is the most handsome man in Bollywood." মীনা কুমারী, মালা সিনহা, অশা পারেখ, সায়রা বানু—সবাই তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধে একাধিক সফল ছবি করেছেন।

'হি-ম্যান' ইমেজের সূচনা

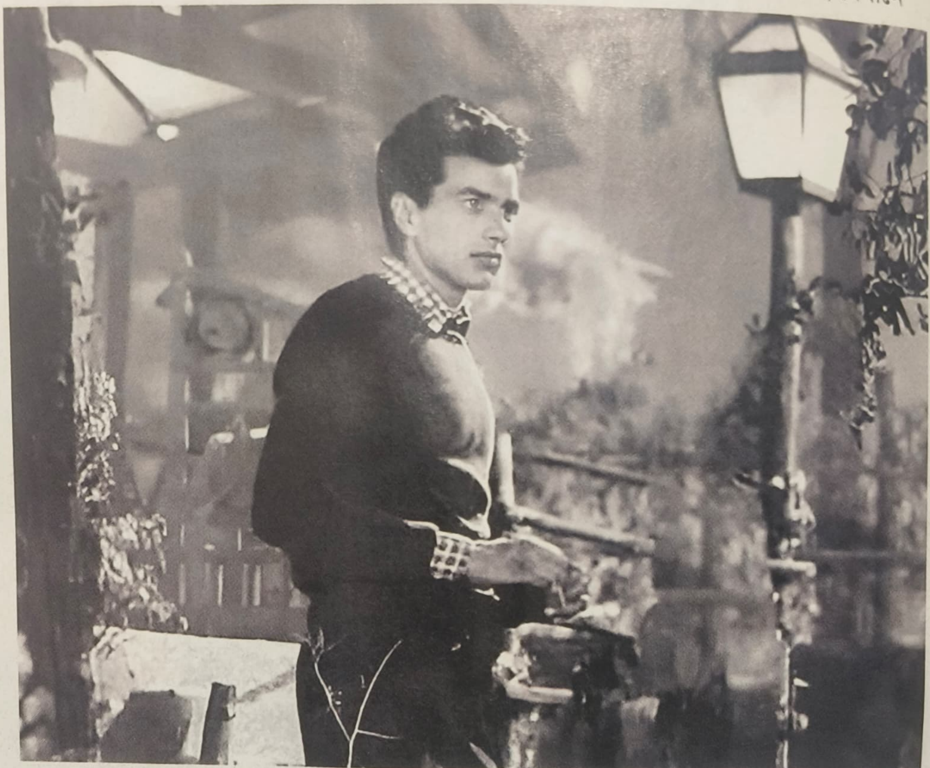
ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে বলিউডে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। সমাজতান্ত্রিক ভাবনা, শহুরে উত্তেজনা, এবং নায়কত্বের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছিল। এই প্রেক্ষিতে ধর্মেন্দ্রর শরীরী শক্তি, পুরুষালি মুখচ্ছবি এবং সাহসী উপস্থিতি তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। 'ফুল অউর পাত্থর' (১৯৬৬) ছবিটিই এই ইমেজের জন্মদাতা। ছবির এক দৃশ্যে, ধর্মেন্দ্রর খালি গায়ে আহত শরীর যখন পর্দায় আসে—সেই মুহূর্তে হিন্দি সিনেমা পেল তার প্রথম 'মাচো হিরো'। দর্শকরা এক নতুন পুরুষত্বের প্রতীক আবিষ্কার করেন। ধর্মেন্দ্রর চরিত্র একদিকে কঠোর, অন্যদিকে আবেগপ্রবণ—এখানেই তাঁর আলাদা জাদু। ছবিটি ছিল বিশাল হিট, এবং ধর্মেন্দ্র রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন 'He-Man' হিসেবে। ওপি রালহান পরিচালিত এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেন এক রাফ, শক্তিশালী, অপরাধীর চরিত্রে—যে ভিতরে অত্যন্ত মানবিক। ছবির বিখ্যাত দৃশ্য, ধর্মেন্দ্র আহত মহিলার গায়ে নিজের জামা জড়িয়ে দেন, বলিউড ইতিহাসে ক্লাসিক

হয়ে গেছে। দর্শকরা তখন প্রথম দেখল এক নতুন ধরনের পুরুষালি নায়ক—যিনি প্রেমিকও, আবার যোদ্ধাও। এই ছবির সফল্য প্রমাণ করে, ধর্মেন্দ্র শুধু রোম্যান্টিক চরিত্রেই সীমাবদ্ধ নন, তাঁর মধ্যে আছে ভিতরের শক্তি, রাগ, আর নেতৃত্বের গুণ। ধর্মেন্দ্রর দেহ ছিল শক্তির প্রতীক, কিন্তু চোখে ছিল এক অদ্ভুত কোমলতা। এই চোখে প্রেম, বেদনা, আর কর্তব্য একসঙ্গে খেলা করত। ঠিক এই কারণেই তিনি পুরুষালি শক্তির মধ্যেও মানবিকতা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর মধ্যে রাজেশ খান্নার মতো রোম্যান্টিক মাধুর্য ও অমিতাভ বচ্চনের আগ্রাসী উপস্থিতি, দুটোরই আভাস মেলে।

রোমান্স ও মাচোইজ়মের মেলবন্ধন

ধর্মেন্দ্রর বিশেষত্ব ছিল—তিনি কেবল অ্যাকশন হিরো নন, প্রেমিক হিসেবেও সমান সফল। এই দ্বৈতভাব তাঁকে আলাদা করেছে সমসাময়িক নায়কদের থেকে। 'চুপকে চুপকে'-র (১৯৭৫)-এর ধীর, মজার অধ্যাপক বা 'শিকার' (১৯৬৮)-এর সংবেদনশীল প্রেমিকের পাশে আমরা দেখি 'মেরা গাঁও মেরা দেশ' (১৯৭১)-এর সাহসী নায়ক বা 'ইয়াদোঁ কী বারাত' (১৯৭৩)-এর প্রতিশোধপরায়ণ ভাইকে। ধর্মেন্দ্রর 'হি-ম্যান' ইমেজ মূলত ভারতের পরিবর্তিত পুরুষত্ব ধারণার সঙ্গে যুক্ত। ছ'য়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে সংবেদনশীল প্রেমিকের বদলে সাতের দশক চেয়েছিল এমন নায়ক, যিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। ধর্মেন্দ্র সেই চাহিদার প্রতীক। কিন্তু তাঁর পুরুষত্বে অহংকার নেই, আছে কোমল মানবিকতা। তিনি প্রেমিক, পিতা, বন্ধু—সব ভূমিকায় একসঙ্গে মানিয়ে যান। এই ভারসাম্য তাঁকে আলাদা করে তোলে। যেমন 'সত্যকাম' (১৯৬৯)-এ সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী প্রকৌশলী চরিত্রে তিনি যে গভীরতা দেখান, তা ভারতীয় সিনেমায় পুরুষ চরিত্রের নৈতিক দায়বদ্ধতার নতুন অধ্যায় খুলে দেয়। ধর্মেন্দ্র অভিনীত ছবিগুলো এক অদ্ভুত গ্রামীণ ভারতের ছবি আঁকে, তারই নায়ক হিসেবে ধর্মেন্দ্রর মধ্যে শহুরে গ্ল্যামার কম, বরং এক গ্রামীণ মাটির গন্ধ চলে আসে। তাঁর সংলাপে, উচ্চারণে, এমনকি চলনে এক পাঞ্জাবি সরলতা ধরা পড়ে। এই গুণটি তাঁকে সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে যায়! 'মেরা গাঁও মেরা দেশ' বা 'লোফার' (১৯৭৩)-এর মতো ছবিতে তিনি যে নায়ককে ফুটিয়ে তোলেন—সে শিক্ষিত নয়, কিন্তু নৈতিকভাবে দৃঢ়। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, প্রেমিকাকে রক্ষা করে। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে ধর্মেন্দ্র যেন ভারতের মাটির ছেলে হয়ে ওঠেন—যে ভালোবাসে, লড়ে, এবং হাসতে জানে। একই সঙ্গে তিনি এমন চরিত্রও করেছেন, যেখানে

> ষাটের দশকরে মাঝামাঝি সময় থেকে সংবেদনশীল প্রেমিকের বদলে সাতের দশক চেয়েছিল এমন নায়ক, যিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী।



প্রথম ছবি 'দিল ভি তেরা, হম ভি তেরে' ছবি থেকেই চিনিয়েছিলেন নিজেকে



'চুপকে চুপকে'র একটি দৃশ্যে। ধর্মেন্দ্রর কমেডি ভাল লেগেছিল দর্শকদের



■ 'শোলে'র শুটিংয়ে পরিচালক রমেশ সিপ্পির সঙ্গে অমিতাভ-ধর্মেন্দ্র



■ হেমার সঙ্গে প্রেম করে ভেঙেছিলেন প্রথাগত সমাজের ভাবনা

তিনি নেহাতই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ধর্মেন্দ্রর আর এক দিক ছিল—তাঁর সহজ হাস্যরসের অনুভূতি। 'চুপকে চুপকে'-তে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তিনি প্রমাণ করেন, 'হি-ম্যান'ও হাসতে জানে, ব্যঙ্গ করতে জানে। বুদ্ধি, রসবোধ আর আকর্ষণীয় সরলতায় তিনি দর্শককে মোহিত করেন। তাঁর পর্দা ব্যক্তিত্ব কেবল শক্তি বা রাগে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর ভিতরে এক খাঁটি হিউম্যান টাচ আছে। ছয়ের দশকের শুরুতে বলিউড ছিল মেলোড্রামা ও রোম্যান্সের যুগ। ধর্মেন্দ্র এখানে নিজের জায়গা পাকা করেন 'আয়ে দিন বাহার কে' (১৯৬৬), 'আয়া সাওয়ন ঝুমকে' (১০৬৯), 'পেয়ার হি পেয়ার', 'মেরে হমদম মেরে দোস্ত' (১৯৬৮) ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে। এই সময়ে পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তাঁর অভিনয় দেখায়, কিভাবে একজন অভিনেতা হাস্যরস, সংযম ও মানবিকতা একত্রে প্রকাশ করতে পারেন।



■ চকোলেট বয়

হৃষিকেশ তাঁকে এমন চরিত্রে কাস্ট করতেন, যেখানে বীরত্ব নয়, বরং মনের সৌন্দর্য মুখ্য। কিন্তু ধর্মেন্দ্র ও ব্যাপারে একটা অদ্ভুত ব্যালান্স করতে পেরেছিলেন, যা সমসাময়িক আর কেউই এত সফলভাবে করতে পারেননি। একই বছরে 'শোলে' ও 'চুপকে চুপকে'-তে দুটো ভিন্ন ইমেজে তাঁকে পেয়েছেন দর্শক। রাজেশ খন্না বা অমিতাভ বচ্চন তাঁর চেয়েও বড় তারকার তকমা পেলেও, দুই মেরুতে এত সাবলীলভাবে যাতায়াত করেননি।

দুঃসাহসী, তেজস্বী, কিন্তু গভীরভাবে আবেগপ্রবণ

সত্তরের সময়ে ভারতীয় সমাজে বদল

আসছিল। শহরজুড়ে দাঙ্গা, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অসন্তোষ—মানুষ তখন পর্দায় দেখতে চাইছিল এক প্রতিবাদী নায়ককে, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। এই পরিবর্তনই বলিউডে নিয়ে আসে অ্যাকশন সিনেমার যুগ। ধর্মেন্দ্র এই সুযোগটা দুর্দান্তভাবে ধরেছিলেন। 'জুগনু', 'ইয়াদোঁ কী বারাত' (১৯৭৩), 'পাত্থর অউর পায়েল' (১৯৭৪), 'ধরম বীর' (১৯৭৭), 'চরস' (১৯৭৬), 'দ্য বার্নিং ট্রেন' (১৯৮০)—এই সব ছবিতে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী, তেজস্বী, কিন্তু গভীরভাবে আবেগপ্রবণ মানুষ। এই চরিত্রগুলোয় ধর্মেন্দ্র শুধু পেশির জোর নয়, দেখিয়েছেন হৃদয়ের গভীরতা। অ্যাকশন দৃশ্যে তিনি ছিলেন স্বাভাবিক। ঘুষি, দৌড়, লড়াই সবই বাস্তব মনে হত। তাঁর শরীরী ভাষা, দৃষ্টি আর কণ্ঠের জোর তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়। 'শোলে'-তে (১৯৭৫) 'বীরু' চরিত্রে তাঁর প্রাণোচ্ছলতা, রোম্যান্টিক বুদ্ধিমত্তা এবং



■ নূতনের সঙ্গে



■ ধর্মেন্দ্রর মাচো ইমেজ মন কেড়েছিল দর্শকের



■ বলিউডের হি ম্যান

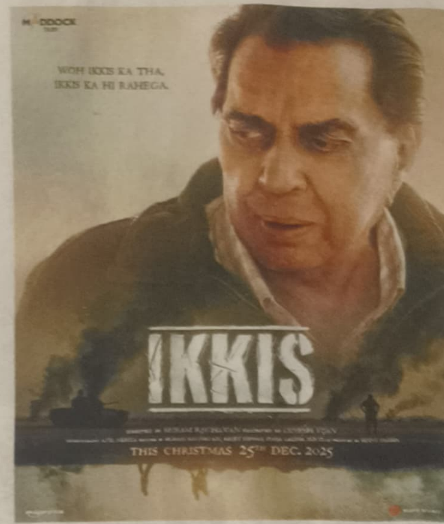
বন্ধুত্বের মানে—সবই তাঁকে জনমানসে স্থায়ী করে দেয়। এই ছবিতে ধর্মেন্দ্র 'হি-ম্যান' ইমেজকে এক নতুন মাত্রা দেন—শুধু পেশির শক্তি নয়, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের শক্তি। ১৯৭৫ সালে মুক্তি পায় 'শোলে', যা কেবল সিনেমা নয়, এক সাংস্কৃতিক ঘটনা। অমিতাভ বচ্চনের 'জয়' চরিত্র সহানুভূতি বেশি পেলেও দুই বন্ধুর চরিত্রের কনট্রাস্ট কখনওই ধরা পড়ত না 'বীরু' না থাকলে। ধর্মেন্দ্রর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পরিচালক রমেশ সিপ্পিকে দু'বার ভাবতে দেয়নি তাঁকে কাস্ট করার ক্ষেত্রে, অনেক আগেই তাঁর রোল চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। "বসন্তী, ইন কুত্তোঁ কী সামনে মত নাচ না..." সংলাপটি হয়তো ধর্মেন্দ্র ছাড়া এভাবে কারও পক্ষে বলা সম্ভবও ছিল না। ধর্মেন্দ্রর বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রায় সব প্রধান নায়িকা—মীনা কুমারী, নন্দা, শর্মিলা ঠাকুর, রেখা, হেমা মালিনী, এমনকি জিনাত আমানও। কিন্তু হেমা মালিনীর সঙ্গে তাঁর অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রি ছিল অনন্য। 'সীতা অউর গীতা', 'রাজা জানি', 'শরাফত', 'ড্রিম গার্ল'—এই সব ছবিতে তাঁদের জুটি দর্শকের হৃদয়ে এক রোম্যান্টিক পরিপূর্ণতা এনে দেয়। ধর্মেন্দ্রর নায়ক চরিত্রের বহুস্তরীয় শেডের সঙ্গে হেমাও বদল করেছেন নিজের ইমেজ, ফলে সেটাও ধর্মেন্দ্রর ক্ষেত্রে একটা বাড়তি সাপোর্ট বলা যেতেই পারে।

ছয়ের দশকের প্রেম, সাতের দশকের ক্রোধ, আটের দশকের সমাজবোধ

ধর্মেন্দ্রর ইমেজ বদল শুধু ঘটনাচক্রে হয়নি, বরং তিনি সচেতনভাবে নিজেকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন। এর পিছনে ছিল তিনটি বড় কারণ, প্রথমত, সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। ছয়ের দশকের প্রেম, সাতের

দশকের ক্রোধ, আটের দশকের সমাজবোধ—ধর্মেন্দ্র সব যুগের অনুভূতিকে নিজের চরিত্রে ধারণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, দর্শকের মন বোঝার ক্ষমতা। তিনি জানতেন, দর্শক শুধু সৌন্দর্য নয়, সাহস খোঁজে। তাই রোম্যান্টিক ইমেজ ছেড়ে অ্যাকশনে আসেন। তিনি অনেক সহযোগিতাও পেয়েছেন। পরিচালক-লেখকরা তাঁকে নতুন চরিত্রে প্রজেক্ট করেন। সলিম-জাভেদ, রমেশ সিপ্পি, রাজ খোসলা—সবাই তাঁর ভিতরের শক্তিটাকে কাজে লাগান। অভিনয়ের বৈচিত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য। ধর্মেন্দ্র কখনও নিজেকে একঘেয়ে হতে দেননি—রোম্যান্স, কমেডি, অ্যাকশন, পিরিয়ড ড্রামা—সব ধারায় সমান দক্ষ। তিনি নিজেই বলেছিলেন, "I never wanted to be known just for my looks. I wanted to be loved for my strength and honesty." এই একটি বাক্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর সাফল্যের সূত্র।

ধর্মেন্দ্রর কেরিয়ার আসলে বলিউডের ইতিহাসের এক আয়না। রোম্যান্টিক প্রেমিক থেকে অ্যাকশন হিরো—এই পথচলা দেখায়, কিভাবে একজন শিল্পী নিজেকে সময়ের প্রেক্ষিতে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন। তিনি কেবল পর্দায় লড়েছেন না, বাস্তবেও লড়েছেন—একজন অভিনেতা হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করার জন্য, দর্শকের হৃদয়ে টিকে থাকার জন্য। ধর্মেন্দ্র মানেই নির্ভীক হাসি, শক্তিশালী চোখ, আর মানবিকতার গভীর ছায়া। তাই তিনি কেবল



এই ডিসেম্বরে ধর্মেন্দ্রকে দেখা যাবে 'ইক্কিস'-এ

"হি-ম্যান" নন, বরং বলিউডের এমন এক প্রতীক, যিনি প্রমাণ করেছেন, আসল পুরুষত্ব মানে শুধু শক্তি নয়, মানবিকতা ও ভালবাসাও। অমিতাভ বচ্চনের 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান' ইমেজের আগেও ধর্মেন্দ্রই সেই মাটির গন্ধময় রাগী পুরুষের সূচনা করেন। অমিতাভ পরবর্তীতে এই ভাবনাকে শহুরে রূপরেখায় নিয়ে গেছেন। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর ভারসাম্য—মাচো এবং কোমলতার মিশ্রণ—এখনও অনন্য। ধর্মেন্দ্রর জনপ্রিয়তা কেবল তাঁর নায়কোচিত চেহারায় নয় বরং তাঁর মানবিক উপস্থিতিতে। তিনি ছিলেন the common man's hero—যিনি চোখে চোখ রেখে কথা বলেন, বড় বড় আদর্শ নয়, সাধারণ ভালোবাসা বিশ্বাস করেন। 'হি ম্যান' ইমেজের আড়ালে থাকে তাঁর মানসিক অবয়ব। শুধু শক্তির প্রদর্শন নয়, বরং ন্যায়, ভালোবাসা ও মানবতার শক্তির এক আন্তরিক প্রকাশ। তিনি সেই নায়ক, যিনি দর্শককে শিখিয়েছেন—পুরুষত্ব মানে রাগ নয়, দায়িত্ববোধ; ভালোবাসা মানে জোর নয়, সহানুভূতি। আজও যখন আমরা বলিউডের নায়কদের দেখি অ্যাকশন ও রোম্যান্সের মিশেলে, তার পেছনে লুকিয়ে থাকে ধর্মেন্দ্রর সেই ঐতিহ্য—যেখানে শরীর ও হৃদয় দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

"Dharmendra redefined masculinity in Hindi cinema — strong yet sensitive, rural yet romantic." — Nasreen Munni Kabir

ধর্মেন্দ্রর সিনেমাজীবন যেন ভারতের মধ্যবিত্ত পুরুষের এক দীর্ঘ আত্মকথা, যেখানে আছে শ্রম, সংগ্রাম, প্রেম আর মানবিকতার জয়।



রাজ কপূরের সঙ্গে একটা পার্টিতে



করণ জোহরের কামব্যাক ফিল্ম 'রকি রানি কি প্রেম কাহানি'-তে আলিয়া ও শবানার সঙ্গে



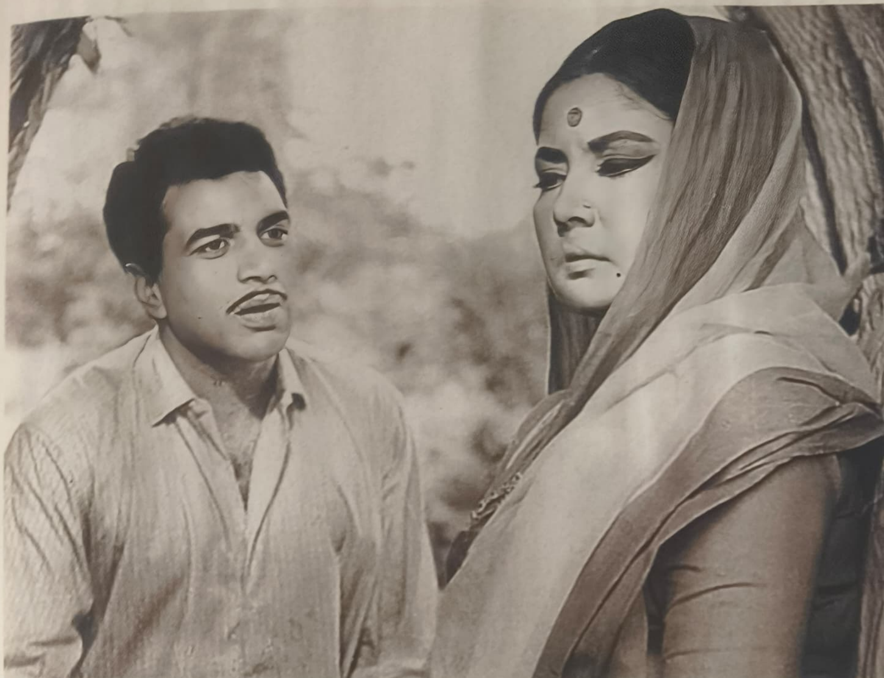
ধর্মেন্দ্রর জবানবন্দি

২০১১-র শেষের দিকে কলকাতায় বেশ কয়েকদিন ছিলেন তিনি। ধর্মতলায় অবস্থিত পাঁচতারা হোটেলের রুমে বসে নিজের অনন্য জীবনকাহিনি শুনিয়েছিলেন **ধর্মেন্দ্র**। শ্রোতা আসিফ সালাম

আমার জন্ম পঞ্জাবে। ছোট থেকেই ছিলাম খুব ডানপিটে। লোকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, অন্যের বাড়ির পাঁচিল টপকে গাছের আম চুরি করা, এ জাতীয় দস্যিপনার জন্য কুখ্যাত ছিলাম। বাবা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার, সঙ্গে আমাদের পারিবারিক চাষবাস ছিল। এরকম একটি পরিবারের ছেলে যে সিনেমার নায়ক হয়ে উঠবেন, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। কল্পনা করেছিলেন শুধু একজন, স্বয়ং আমি। বরাবরই জেদি স্বভাবের ছিলাম। স্কুলজীবন থেকে হিন্দি ছবির পোকা ছিলাম, বাড়ির কাছে সিনেমা হল না থাকায় মাইলের পর মাইল হেঁটে হলে গিয়ে সিনেমা দেখতাম। সেই সময় থেকেই নিজেকে পরদায় দেখার স্বপ্ন বুনে ফেলেছিলাম। আর সেই স্বপ্ন এবং জেদ আমাকে পৌঁছে দেয় বলিউডে।

সুরাইয়াজির চুমু ছিল রিটার্ন গিফট

এখনও ছবির মতো ভেসে ওঠে সবকিছু। বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে সিনেমার টিকিট কাটতাম। অনেক সময় আবার স্কুলের বই কেনার নাম করেও টাকা আদায় করতাম। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই পাকা বুদ্ধি ছিল। তাই বাবা কোনওদিনও আমার এইসব কীর্তিকলাপ ধরতে পারেননি। সুরাইয়াজি ছিলেন আমার আইডল। অসম্ভব ফ্যান ছিলাম ওঁর। সুরাইয়াজির অভিনীত 'মির্জা গালিব' ছবিটি পাঁচবার হলে গিয়ে দেখেছিলাম! ওঁর প্রচুর পোস্টারও সংগ্রহ করে রাখতাম। অনেক পরে মুম্বইতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাতের সুযোগ হল, আমি পোস্টারের ফাইলটা ওঁকে গিফট করেছিলাম। তার



মীনা কুমারীর প্রতি যে ভাল লাগা ছিল, তা স্বীকার করে নেন ধর্মেন্দ্র

পরিবর্তে উনি আমাকে গালে একটা চুমু উপহার দিয়েছিলেন! চুমুর রেশটা ধরে রাখার জন্য গালে অনেকদিন জল বা সাবান লাগাইনি! তবে বলিউডের প্রবেশের পথ আমার জন্য একেবারেই মসৃণ ছিল না। তথাকথিত কোনও গডফাদার তো ছিল না। আমি নিজের তাগিদেই বাড়ি ছেড়ে মুম্বই পাড়ি দিই। সেই সময় এক দেশব্যাপী ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমি বিজয়ী হই। তখনই মুম্বইতে ডাক পড়ে। আমি তো আনন্দে আত্মহারা। ধরেই নিয়েছি, আমার বলিউডের নায়ক হওয়া আর কেউ আটকাতে পারবে না। মুম্বইতে প্রযোজক অর্জুন হিঙ্গোরানি আমাকে তাঁর নতুন ছবি 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে' ছবির জন্য সাইন করান। ওই যে বাড়ি ছেড়ে মুম্বই গেলাম, এতে আমার পরিবারের কোনও সমর্থন ছিল না। বাবা তখন আমাকে অনেক কটূ কথা শোনান। আমি বাবাকে চ্যালেঞ্জ করে বলি, একদিন এই পঞ্জাবে আমার বড় পোস্টার পড়বে। আসলে আমার বাড়ির সকলে বলতেন, আমি কখনও 'নায়ক' হতে পারব না কারণ আমার নায়কোচিত চেহারা নয়। রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতাম আর ভাবতাম, কীভাবে নিজের চেহারাকে নায়কোচিত করে তোলা যায়। সেই সময়কার হিন্দি ছবির জনপ্রিয় সংলাপ পাঠ করে বন্ধুদের শোনাতাম, কিন্তু কেউ-ই আমাকে সেভাবে সমর্থন করেনি। তো মুম্বইতে প্রথম ছবির শুটিং হল, হলে রিলিজ় করল। কিন্তু ছবিটি সুপার ফ্লপ হল। বাবার সঙ্গে কথা বলারও সাহস হয়নি তখন। মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, পরের ছবিটি হিট না হলে, কোনও অজানা জায়গায় চুপচাপ পালিয়ে যাব। পরিবারের লোককে ফেস করার আর সাহস ছিল না কারণ আমি অনেক বড়-বড় কথা বলে বাড়ি ছেড়ে এসেছিলাম। খুব একটা স্ট্রাগল না করেই পরের দুটো ছবি পেয়ে গেলাম! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, পরের দুটো ছবি আরও বেশি ফ্লপ করল। ডিজ়াস্টার যাকে বলে আর কী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা হল। সেই সময়টা কখনও ভুলব না।

আত্মহত্যা করার মুখে...

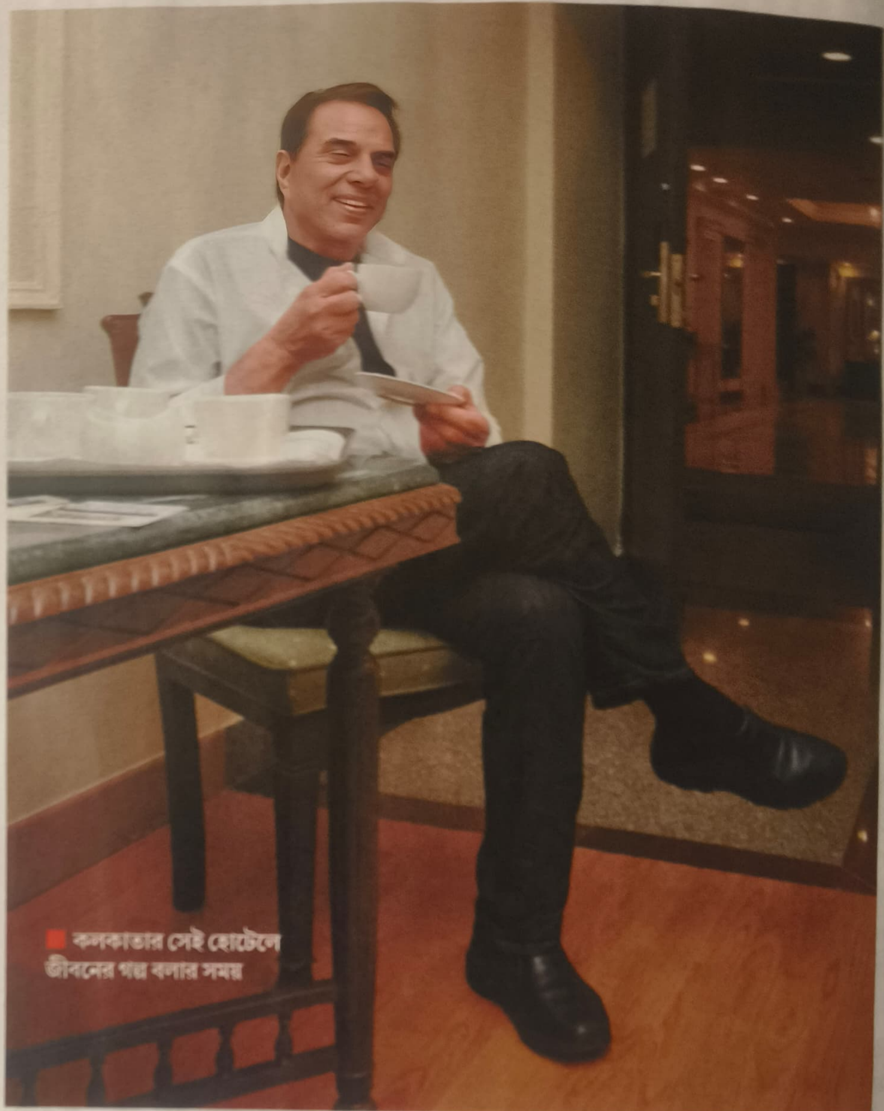
পালিয়ে আর কোথায় যাব, তাই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে জীবনটাই শেষ করে দেব। চারিদিকে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে, পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, বন্ধুদের ফেস করার মতো মনের অবস্থা নেই...আমি তখন পুরো একা। ফ্লপের হ্যাট্রিক নিয়ে বসে আছি। অথচ বাড়ি ছেড়ে বেরনোর সময় কত বড়-বড় কথা বলে এসেছি। তাই একপ্রকার ঠিক করেই নিলাম, অনেক হয়েছে, আমি নিজের জীবন শেষ করে দেব। বিশ্বাস করুন, এখনও কথাগুলো বলতে গিয়ে হাত-পা কাঁপছে। একটা মানুষ যখন ঠিক করে যে সে আত্মহত্যা করবে, তার কতটা মনের জোর দরকার হয় বলুন তো? মুম্বইয়ে আমি যে এক কামরার ঘরে থাকতাম, সেটা খুবই ছোট ছিল। আমি বিছানায় শুয়ে হাঁ করে সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবছি কীভাবে ফ্যানের সঙ্গে কাপড়টা বেঁধে গলায় ফাঁস দিলে আমার শান্তিতে মৃত্যু হবে। ঠিক সেই সময় আমার জীবনে ঈশ্বরের দূত হিসেবে আগমন হয় আমার বন্ধু তেজার। তেজাও টুকটাক অভিনয় করত আর সেই সময় মুম্বইতে ওই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। আমার ঘরে ঢুকে ও বলল, পরিচালক বিমল রায় ওঁর পরের ছবির জন্য নতুন মুখ খুঁজছেন, আমার নাকি প্রচুর সম্ভাবনা আছে। নিমেষের মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা ত্যাগ করে আবার মানসিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এক নতুন আলোর সন্ধানে। আসলে তখন বয়স কম, রক্ত গরম। তাই যত তাড়াতাড়ি বিষণ্ণতা গ্রাস করত, ঠিক তত তাড়াতাড়ি নতুন কিছু করার উৎসাহও মনে বাসা বাঁধত।



তাঁর শারীরিক অ্যাপিল ছিল টাইমলেস

বিমলদার কাছে ভাত-মাছের ঝোল খাওয়া

বিমল দা-র ছবির অডিশনের ভেনু ছিল পশ্চিম বান্দ্রায় অবস্থিত নুর স্টুডিয়ো। আমি আমার সেরা পোশাকটা পরে, মুখে হাসি এবং একরাশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে পৌঁছলাম অডিশন দিতে। ওখানে পৌঁছে তো বাঘের মুখে পড়ার মতো অবস্থা। কারণ অডিশন নিচ্ছিলেন বিমল রায় এবং সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গুরু দত্ত সাহেব। গুরু দত্ত সাহেবকে দেখে তো আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় দত্তসাহেবের শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাঁর এনার্জি লেভেল ছিল চোখে পড়ার মতো। কী গ্ল্যামার, কী ব্যাক্তিত্ব। আমি এমনিতেই ওঁর খুব বড় ফ্যান ছিলাম। সেদিনের পরিস্থিতিটা ভাবুন একবার, একদিকে বিমল রায়, অপরদিকে গুরু দত্ত। অনেকের মুখে শুনেছিলাম, বিমলদা নাকি খুব কড়া, একটু ভুল হলেই জোর বকুনি দিতেন। আমার অবশ্য বকুনি খাওয়ার অভ্যেস ছিল। স্কুলের টিচারদের কাছ থেকে বকুনি খেতে-খেতে সয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, আমি সেদিন ভাল করেই অডিশন দিলাম। আমার অভিনয় দেখে গুরু দত্তসাহেব উত্তেজিত হয়ে হাততালি



কলকাতার সেই হোটেলে জীবনের গল্প বলার সময়

> ‘বন্দিনী’ হিট করার পর, ভাত-মাছের ঝোল আমার প্রিয় ও লাকি খাবার হয়ে ওঠে। শুভ কাজে যাওয়ার আগে ভাত-মাছের ঝোল খেতাম! সেই থেকেই বাংলার সঙ্গে সংযোগ তৈরি।

দিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিমলদার মুখে কোনও অভিব্যক্তি দেখলাম না। উদাসীন মুখে লাঞ্চ ব্রেকের ঘোষণা করে একটি ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। বুঝতেই পারছিলাম না বিমলদার আমার অভিনয় পছন্দ হয়েছে, নাকি হয়নি। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর বিমলদার এক সহকারি পরিচালককে ডেকে, আমার অভিনয় কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করায়, উনি আমাকে বিমলদার সেই ঘরটার দিকে যেতে বললেন। অনুমতি নিয়ে ওঁর ঘরে প্রবেশ করে প্রথমেই বিমলদাকে বলেছিলাম, ‘আমি এর চেয়ে আরও অনেক ভাল অভিনয় করতে পারি। আপনি যদি আমাকে আর একটু সুযোগ দেন...’ আমি যেন মনে-মনে ধরেই নিয়েছিলাম যে, বিমলদার আমার অডিশন পছন্দ হয়নি। বিমলদা একইরকম নির্বিকার মুখে আমার দিতে তাকিয়ে, একটা স্টিলের টিফিন বাক্স বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, বাক্সে ওঁর স্ত্রীর হাতে রান্না করা ভাত-মাছের ঝোল আছে, আমি যেন সেটা খেয়ে নিই। ব্যস, অমনি আমার সমস্ত টেনশন দূর হয়ে গেল! কারণ আমার মনে হয়, মাছের ঝোল খেতে বলছেন মানে বিমলদার আমার অভিনয় পছন্দ হয়েছে! দাদার সেই বিখ্যাত ছবিটির নাম ছিল ‘বন্দিনী’। সেই ছবি, যা আমার ভাগ্যের দরজা খুলে দেয়। নূতন এবং অশোককুমারের সঙ্গে এই ছবিতে আমার অভিনয়ও খুব প্রশংসিত হয় এবং আমি একাধিক পুরস্কারও পাই। খবরের কাগজে হেডলাইন বেরিয়েছিল, ‘ধর্মেন্দ্র, দ্য স্টার ইজ় বর্ন’। এই ছবির শুটিংয়ে বিমলদা প্রায় প্রত্যেকদিন বৌদির হাতে রান্না করা মাছের ঝোল-ভাত খাওয়াতেন। না খেতে চাইলে হুমকি দিতেন, ছবি থেকে বাদ দিয়ে দেবেন! ওই মানুষটার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ‘বন্দিনী’ হিট করার পর থেকে ভাত-মাছের ঝোল আমার প্রিয় ও লাকি খাবার হয়ে ওঠে। কোনও শুভ কাজে যাওয়ার আগে আমি ভাত-মাছের ঝোল খেতাম! সেই থেকেই বাংলার সঙ্গে আমার সংযোগ তৈরি হয়। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে কলকাতা শহরের সঙ্গে। পুরনো আমলের গ্র্যান্ড হোটেল, ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের জমকালো পানশালা, বো-ব্যারাক, উত্তর কলকাতার ফিশ কবিরাজি... এখনও



বরাবর ফিটনেসের দিক থেকে তুখোড় ধর্মেন্দ্র

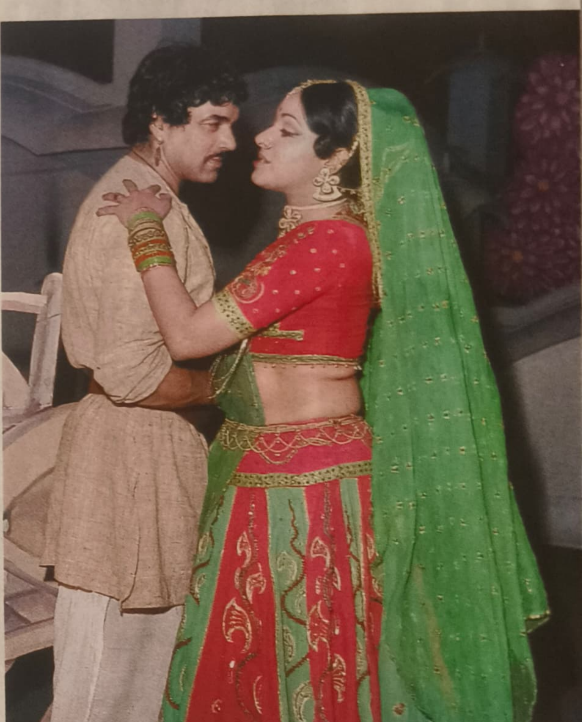


কলকাতার এক রেস্তরাঁতে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে

স্মৃতির মধ্যে সব টাটকা রয়ে গিয়েছে।

সুচিত্রা সেনকে খুব মিস করি

এই যে বললাম কলকাতার সঙ্গে আমার একটা মনের টান আছে। সেটার কারণ একদিকে যেমন বিমলদার স্ত্রীর হাতের মাছের ঝোল-ভাত খাওয়া, অন্যদিকে আর একজন সুন্দরী রমণীর স্পর্শ, সুচিত্রা সেন। 'মমতা' ছবিতে ওঁর সঙ্গে অভিনীত 'ও জানেওয়ালে, হো সকে তো লৌট কে আনা', এই গানটা আমার ফেভারিট। সুচিত্রার সঙ্গে আমার একটা দারুণ বন্ডিং গড়ে উঠেছিল। সেই সময়কার সবচেয়ে সুন্দরী নায়িকা ছিলেন। কী জৌলুস, কী রূপের ছটা! ওঁর সঙ্গে শুটিং করতে হলে নিজের কাজের প্রতি মন দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ত। আমি তো হাঁ করে ওঁর দিকে চেয়ে থাকতাম। এর জন্য 'মমতা' ছবির পরিচালক অসিত সেনের কাছে আমি অনেক বকুনিও খেয়েছি! সংলাপ ভুলে গিয়েছি, ফ্রিজ় হয়ে গিয়েছি... কী করব, সামনে ওরকম একজন ডাকসাইটে সুন্দরী দাঁড়িয়ে! আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলতে পারি, একবার যদি কেউ সুচিত্রাকে সামনে থেকে দেখেন, তাহলে তিনি তাঁর প্রেমে পড়তে বাধ্য। 'মমতা' ছবির শুটিংয়ের জন্য আমি বেশ কিছুটা সময় এই শহরে কাটিয়েছি। পাঁচতারা হোটেলে থাকলে কী হবে, আমার মন পড়ে থাকত কলকাতার স্ট্রিট



হেমা মালিনীর প্রতি অগাধ প্রেম ছিল ধর্মেন্দ্রর

ফুডের দিকে। এমনিতেও আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর যে-কোনও পাঁচতারা হোটেলের খাবারের চেয়ে রাস্তার দোকানের খাবার অনেক বেশি সুস্বাদু হয়। কলকাতায় থাকাকালীন নিয়ম করে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের দিকে যেতাম। ওখানে তো পানশালার রমরমা। আমার প্ল্যান থাকত, প্রত্যেকটি পানশালায় একবার করে প্রবেশ করার। একটিতে এক পেগ পান করে আবার অন্যটিতে যেতাম! চাট হিসেবে আমার পছন্দ ছিল ড্রাই চিলি চিকেন। বিশ্বাস করুন, অনেক জায়গায় এই পদটি খেয়েছি। কিন্তু ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের

সেই খাবার ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের চিলি চিকেনের চেয়ে বেশি সুস্বাদু হত না! এখন সবকিছু কেমন বদলে গিয়েছে। সুচিত্রা কত ছটফটে, দুরন্ত ছিলেন, সেই মহিলাই নাকি নিজেকে ঘরবন্দি করে নিয়েছিলেন! ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের সেই পানশালাগুলোও হয়তো এখন বদলে গিয়েছে।

আমাকে নিয়ে রাজনীতি

আমি জীবনে অনেকবার নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছি। খুব বেশি পড়াশোনা করিনি ঠিকই, তাই বলে পেটে যে একেবারেই বিদ্যে নেই, তা তো নয়। ২০০২ সালে যখন আমার কবিতার বই প্রকাশ হল, অনেকেই তা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছেন। অনেকে আবার বোদ্ধার মতো মন্তব্য করেছেন, এটা নাকি মীনা কুমারীর প্রতি আমার প্রেম নিবেদন! মীনা কুমারীর বিরহেই আমি নাকি কবি হয়ে গিয়েছি। আরে বাবা, তাহলে তো অনেক



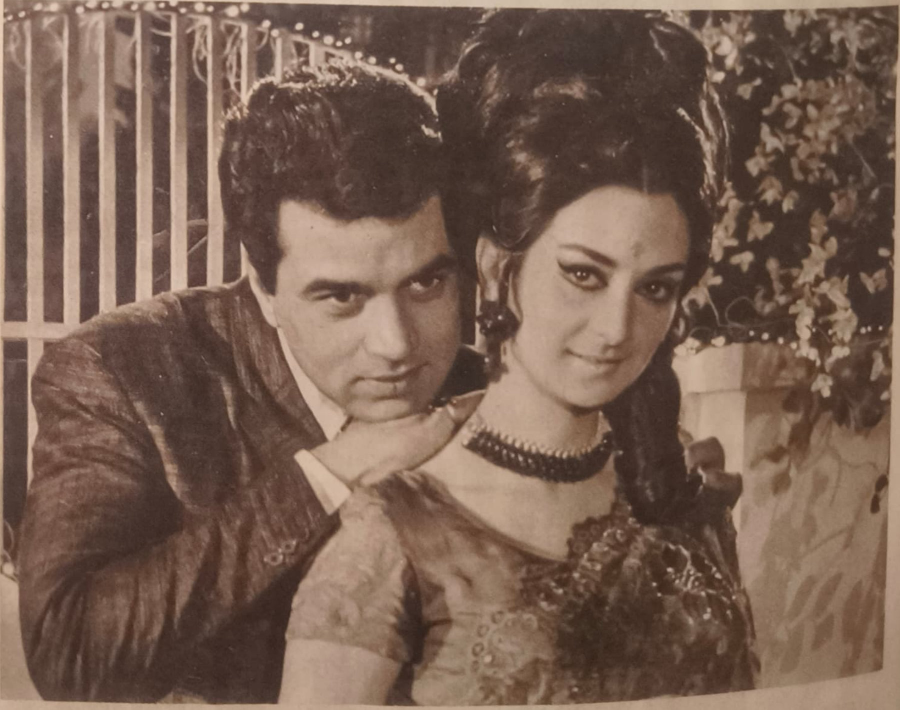
রেখার সৌন্দর্যের পূজারি ছিলেন তিনি



মেহমুদ ও সঞ্জীব কুমারের সঙ্গে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব



শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে সেটে ধর্মেন্দ্র



সায়রা বানুর সঙ্গে

পানশালাগুলোর ড্রাই চিলি চিকেনের মতো সুস্বাদু চিকেন আর কোথাও খাইনি। তবে আমার এই পানশালায় যাওয়া নিয়ে সুচিত্রা সেন খুব রেগে যেতেন। উনি বলতেন, এইসব পানশালার খাবার নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। আমি ওঁকে মজা করে বলতাম, ক্ষতিকারক খাবার খেতে খুব সুস্বাদু হয়। সেটে সারক্ষণ ওঁর পিছনে লাগতাম। যদিও সুচিত্রা আমার চেয়ে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন। সেটে প্রায়দিনই উনি সকলের জন্য বাড়ি থেকে সুস্বাদু খাবার নিয়ে আসতেন। যদিও



অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা বলে গর্ববোধ করতেন ধর্মেন্দ্র

আগেই দেবদাস হয়ে যেতাম! আর ওঁর জন্য কবিতা লেখা কেন, অন্য অনেক কিছুই করতে পারতাম। আমি মনে করি, মানুষ যখন কোনও অসহায় অবস্থায় পড়েন, সে সময়ে মুখের ভাষায় সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন না, তখনই কবিতার আশ্রয় নেন। আর মীনা কুমারীর সঙ্গে আমার যোগসূত্র তো বহুবছর আগের কথা। আমার কবিতার সঙ্গে সেই ঘটনার কোনও যোগাযোগ নেই। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ? আমাকে কত অপবাদই না দেওয়া হয়েছে। বলিউডে শক্ত জমি খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি নাকি মীনাকে ব্যবহার করেছি! ওঁর টাকায় আমি নিজের জন্য জামাকাপড় কিনেছি, ওঁর গাড়ি নিয়ে শুটিংয়ে গিয়েছি... অনেকে তো এটাও ভাবেন যে, মীনা কুমারীর মৃত্যুর জন্য আমিই নাকি দায়ী! ভাবলে হাসি পায়, এই মানুষগুলোই আবার মন্তব্য করেন আমি নাকি মীনার জন্য কবিতা লিখেছি! আরে বাবা, যাঁকে আমি হত্যা করেছি, তাঁর জন্যই আমি কবিতা লিখব! আমি কি পাগল? হ্যাঁ, মীনার সঙ্গে আমার একটা ভাল লাগার সম্পর্ক ছিল। আমি ওঁর কেয়ার করতাম। কখনও চাইনি ওঁর কোনও ক্ষতি হোক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওঁকে ওঁর বিশৃঙ্খল জীবনযাপন থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারিনি। মদ্যপান করে নিজের জীবনটা শেষ করে দিল। শেষে আমিও হাল ছেড়ে দিয়ে ওঁর জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিই। এটাই যদি আমার দোষ হয়, তা হলে আমি অপরাধী। আর শুধু কি মীনা, আমার সঙ্গে আমার ছেলেমেয়ের সম্পর্ক নিয়েও কত নোংরা রাজনীতি করা হয়েছে। দম আটকে আসত এই সব শুনে। মানছি আমি জীবনে একাধিকবার প্রেমে পড়েছি, কিন্তু প্রেম করাটা কি অপরাধ? আমি জানতে চাই, কোন আইন এটাকে ক্রাইম বলে ব্যাখ্যা করে? মীনাকে ভালবাসলাম কিন্তু তার



নাতিদের প্রিয় দাদু ধর্মেন্দ্র

বিনিময়ে শুনতে হল, আমি নাকি ওর হত্যাকারী! এখনও এই অপবাদ আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে। রাতে ঘুমোতে পারি না। প্রকাশের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন আমার মাত্র ১৯ বছর বয়স। বেশ ইমম্যাচিয়োর ছিলাম। তবে এটা ঠিক, প্রকাশ ছিল একেবারে পিকচার পারফেক্ট ওয়াইফ। আজও প্রকাশকে আমি খুব-খুব ভালবাসি। তবে আমি অস্বীকার করব না, সেই ভালবাসার কিছুটা অংশ আমি হেমাকেও দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ওঁর সৌন্দর্যের সামনে মাথা নত না করে থাকতে পারিনি। আমি কিন্তু আমার সমস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি। হেমাকে বিয়ে করার পরেও প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব সামলেছি। বাবা হিসেবে সব ছেলেমেয়ের দায়িত্ব পালন করেছি। আশেপাশে কতজনকে দেখেছি দ্বিতীয় বিয়ে করার পর প্রথমপক্ষের সন্তানদের ভুলেই যায়! আমি কিন্তু সেরকম কিছু করিনি। তাও আমাকে শুনতে হয়েছে, আমি নাকি বাবা হিসেবে কলঙ্ক। যখনই এই অপবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়েছি, তখনই লোকেরা তেড়ে এসেছেন একটাই প্রশ্ন নিয়ে। ভাল বাবা হলে দু'বার বিয়ে করলাম কেন? এখন মনে হয়, কাউকে সত্যিকারের ভালবাসাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ। যদিও আমার সন্তানরা আমাকে খুব ভালবাসে। সানি আর ববি তো আমাকে 'বড় ভাই' বলে মনে করে। কখনও বা আবার মনে হয়, আমিই ওদের ছেলে! ছেলেবেলায় ওরা আমার পরামর্শ ছাড়া কোনও কাজ করত না। এখন আবার তাদের অনুমতি নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়। সানি-ববির দুই বোন বিজিতা আর অজিতা বিদেশে ওদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে এষা আর অহনা আমাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। তবে এষা সিনেমাতে আসুক, এটা আমি কখনও চাইনি। আমাদের সমাজে কোনও বাবা-ই চাইবে না তার মেয়ে সিনেমায় নামুক। আমরা সকলেই জানি এই ইন্ডাস্ট্রিটা

মেয়েদের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। আমি অন্তত তাই মনে করি। বহুবছর ধরে বলিউডে সংসার পেতেছি। তাই সবকিছুই আমার জানা, আমার দেখা। তবে হ্যাঁ, এষা যখন ঠিকই করে নিয়েছে যে ও অভিনয় করবে, বাবা হিসেবে ওকে সবসময় রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

হেমার প্রেমিক হিসেবে আমাকে হিংসে করত

অনেকে ভাবেন আমার এবং হেমার প্রেম হয় 'শোলে'র শুটিংয়ে। কিন্তু সেটা ভুল। আসলে আমাদের প্রেমপর্ব শুরু হয় 'সীতা অউর গীতা'র শুটিংয়ের সময় থেকেই। হ্যাঁ, বলতে পারেন 'শোলে'র সময় প্রেমটি আরও জোরালো হয়। মনে আছে, সেই সময় বহু পুরুষ হেমার প্রেমে পাগল ছিল। প্রত্যেকদিন অন্তত দশ-বারোটা প্রপোজ়াল আসত। অনেকেই আমাকে হেমার প্রেমিক হিসেবে মেনে নিতে পারেনি, হিংসে করত! 'সীতা অউর গীতা'র সেটে আমার এবং সঞ্জীবকুমারের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত, কে হেমাকে ইমপ্রেস করবে! প্রত্যেকবার অবশ্য বাজি আমি-ই জিততাম। সঞ্জীবভাই বলতেন, এখানে তো



কলকাতার হোটেলে

আমি কোন ধর্ম অবলম্বন করে বিয়ে করলাম সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি ভালবাসাকেই ধর্ম মানতে চাই। যুদ্ধ করলেও দোষ, আবার প্রেম করলেও দোষ! এটা কী করে হয়!

হেমার ডবল রোল। উনি সীতা-কে নেবেন আর আমি যেন গীতা-কে নিয়ে থাকি! আমার আর হেমার মধ্যে কী সুন্দর একটা সম্পর্ক আছে। অথচ তাই নিয়ে কত নোংরা রটনা হল। সেই সময় সবচেয়ে আলোচ্য গসিপ ছিল, 'ধরম-হেমার কেচ্ছা'। আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। আমাদের প্রেমকে যোগ্য সম্মান দেওয়া জরুরি ছিল, তাই তড়িঘড়ি বিয়ে করতে হয় আমাদের। আর আমি কোন ধর্ম অবলম্বন করে বিয়ে করলাম, সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি ভালবাসাকেই ধর্ম মানতে চাই। যুদ্ধ করলে দোষ, আবার প্রেম করলেও দোষ, এটা কী করে হয়!

এখনও ভিলেন পিটিয়ে নায়িকার সঙ্গে নাচতে পারি

এখন তো আমি দাদু হয়ে গিয়েছি। আমার দুই নাতি রাজবীর এবং করণ, মানে সানির দুই ছেলে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওদের একটাই টার্গেট, আমাকে পাঞ্জায় হারানো। এছাড়া আমার আরও দুই সৈনিক, মানে ববির ছেলে ধরম এবং আর্যমান। ধরমের নাম রাখা হয়েছে আমার নামে। আর্যমান আবার কোথাও গেলে আমার ছবির সংলাপ সকলকে শোনাতে থাকে। ওরা সকলেই আমার ফ্যান। ওরা বলে, 'দাদু তুমি এখন কেন অ্যাকশন ছবি করো না?' আসলে, কেউ দেয় না বলে করা হয় না, আমি কিন্তু এখনও দিব্যি ফিট। এখনও অনায়াসে দশ-বারোটা ভিলেনকে পিটিয়ে নায়িকার সঙ্গে লাফাতে-লাফাতে নাচ করতে পারি। আমাকে এরা পরপর দু'বার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। কিছুতেই বুঝতে চায় না, আমাকে আসলে 'ইয়ং ট্যালেন্ট'-এর জন্য পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই ইন্ডাস্ট্রি আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। আমি কোনও লবিতে বিশ্বাস করি না, সকলকে নিয়ে চলতে ভালবাসি। তবে হ্যাঁ, মেহমুদ, দিলীপকুমার এবং অমিতাভ বচ্চন আমার খুব কাছের। তাঁদের সঙ্গে প্রচুর সুখ-দুঃখের কথা শেয়ার করেছি। তাছাড়া এখনকার দিনের অনেকেই আমাকে বড়দা হিসেবে শ্রদ্ধা করে। যেমন শাহরুখ খান। মাসে অন্তত একবার করে আমার বাড়িতে আসবেই। খুব পরিশ্রমী ছেলে। আর সলমন তো আমার নিজের ছেলের মতো। ঠিক আমার মতোই রগচটা স্বভাবের, কিন্তু মনটা ভাল। আর হ্যাঁ, সুচিত্রা, হেমা আর মীনা বাদে নায়িকাদের মধ্যে আমার ক্রাশ ছিল রেখা। কী গ্ল্যামার মহিলার! আর পাঁচজন সাধারণ পুরুষের মতো আমিও রেখার পূজারি ছিলাম। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কখনও কোনও প্রেমের সম্পর্ক হয়নি।

আমার একটাই মোটো। জীবনটা উপভোগ করুন। আপনার পাশে কেউ থাকুক বা না থাকুক, নিজেকে কখনও একলা মনে করবেন না। সেলিব্রেট লাইফ!

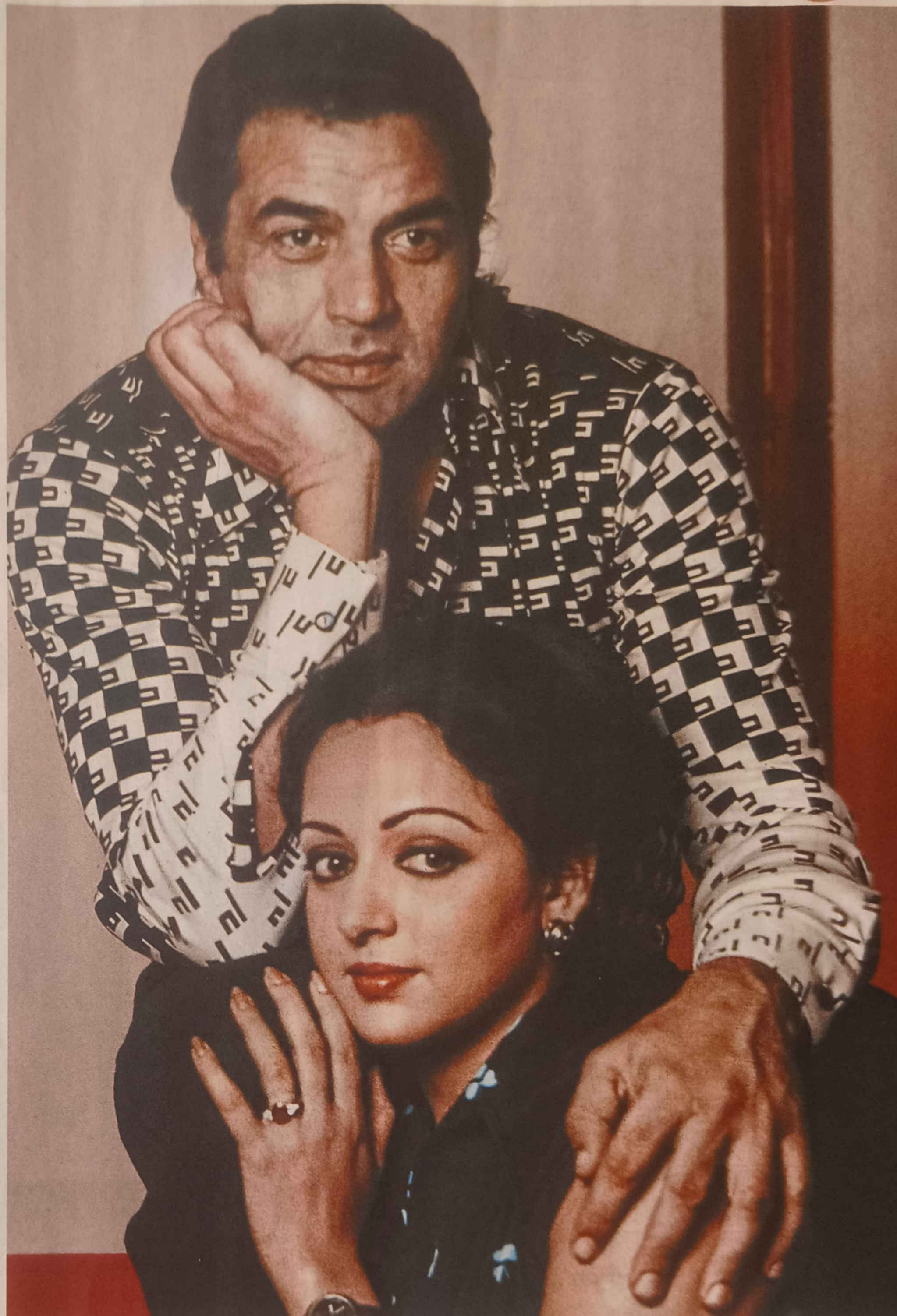
হেমা-ধরম অমরপ্রেম

হেমা মালিনী-র চোখে কেমন ছিলেন **ধর্মেন্দ্র**? মুম্বইতে সাংবাদিকতা ও **হেমা মালিনী**র অটোবায়োগ্রাফির লেখক তথা জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় শোনালেন বহু অজানা গল্প

প্রায় ৩৫ বছর ধরে এই পরিবারটাকে সামনে থেকে দেখেছি। তাই হঠাৎ করে ধরমজিকে নিয়ে বলতে শুরু করলে একটু খেই হারিয়ে ফেলি, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব। এত স্মৃতি, এত গল্প-আড্ডার আসর...তার মধ্যে কিছু ঘটনা বাইরে বলার মতো, কিছু ব্যক্তিগত স্তরেই রাখা বাঞ্ছনীয়। নিজের চোখে দেখা এবং অনেকটাই হেমাজির মুখে শোনা, সবমিলিয়ে মানুষ ধর্মেন্দ্রর আমি খুব বড় ফ্যান। উনি এই গোটা পরিবারের মাথার ছাতা ছিলেন, ওঁর পরামর্শ ছাড়া হেমাজির বাড়ির কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হত না। আমি যখন হেমাজির বাড়িতে প্রথমদিকে যাওয়া শুরু করি, তখন ধরমজি ওয়র্কিং। সেই সময় হেমাজিও কামব্যাক



হেমার বাড়িতে রামকমল



এই জুটি ছিল একে-অপরের পরিপূরক

করেছেন। কিন্তু হেমাজির বাড়িতে কখনও ওঁদের দু'জনকে কাজ নিয়ে আলোচনা করতে দেখিনি। নেভার। অন্য সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বললেও, কাজ নিয়ে আমার সামনে কখনও কথা বলতে শুনিনি। পরবর্তীকালে হেমাজির কাছেও শুনেছি, ধরমজি নাকি কাজ নিয়ে বাড়ির ভিতর কথা বলতে পছন্দ করতেন না। এমনকি উনি কখনও চাননি, বাড়ির আর কেউ সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আসুক। এষার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আসা নিয়ে হেমাজির সঙ্গে ধরমজির বড়সড় একটা বিবাদ হয়। এই ঘটনা নিয়েই লেখাটা শুরু করি।

ছ'মাস কথা বন্ধ

এমনিতে আমি যত দুর জানি, হেমাজির সঙ্গে ধরমজির খুব বড়সড় কোনও ঝামেলা কখনও

হয়নি। ধরমজিকে বাড়ির সকলেই ভয় পেতেন। এও শুনেছি যে, এষা আর অহনা যখন ছোট, তখন ওরা বাড়িতে টেপ রেকর্ডার অন করে হেমাজির গানে নাচত। হেমাজিও মাঝেমধ্যে ওদের জয়েন করতেন। কিন্তু ধরমজির গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলেই, টেপ রেকর্ডার অফ করে এষা-অহনা বই নিয়ে পড়তে বসে যেত! ধরমজির ড্রাইভারের কাছে হেমাজির নির্দেশ ছিল, বাড়ির গলির মুখে এসে দু'বার একই প্যাটার্নে গাড়ির হর্ন বাজাবেন এবং তাতেই হেমাজিরা বুঝে যাবেন যে, ধরমজি আসছেন। সারা বছর যতই হেমাজি দুই মেয়ের পড়াশোনা দেখুন না কেন, স্কুলের রিপোর্ট কার্ডে কিন্তু ধরমজি-ই সই করতেন। সারাজীবনে একবারই হেমাজি ও ধরমজির মধ্যে বিস্তর ঝামেলা হয়েছিল, তা ছিল এষার সিনেমাতে আসা নিয়ে। ধরমজি বিশ্বাস করতেন মেয়েদের জন্য সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি একেবারেই সঠিক জায়গা নয়। এরকম কিন্তু নয় যে, ধরমজি চাইতেন মেয়েরা বাড়িতে বসে থাক। উনি চাইতেন ওরা অন্য কোনও কাজ করুক। কিন্তু সিনেমায় অভিনয় নয়। হেমাজি যখন কাজ করতেন, তখনও কিন্তু ধরমজি ওঁকে নিয়ে খুব প্রোটেক্টিভ ছিলেন। হেমাজি যখন জানান যে এষা সিনেমাতে অভিনয় করতে চায়, বেঁকে বসেন ধরমজি। উনি স্পষ্ট জানান, এই বিষয়ে তাঁর মত নেই। এষা অন্য যা করতে চায় করুক, কিন্তু সিনেমাতে অভিনয় নয়। কিন্তু হেমাজিও এই বিষয়ে একনিষ্ঠ ছিলেন যে, এষা যাতে তাঁর মনের ইচ্ছে পূরণ করতে পারেন। কারণ তিনি নিজেও যেহেতু নায়িকা ছিলেন, তাই তাঁর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল যে, মেয়ে নায়িকা হতে চাইলে ক্ষতি কী! এই প্রথমবার ধরমজির মতের বিরুদ্ধে গিয়ে এষা সিনেমাতে অভিনয় শুরু করেন। এর ফলে প্রায় ছ'মাস হেমাজি আর ধরমজি একে-অপরের সঙ্গে অভিমান করে কথা বলেননি! এষার ডেবিউ



হেমার নাচের ফ্যান হলেও মঞ্চে তাঁর নাচ দেখতে লজ্জা পেতেন ধর্মেন্দ্র

ধরমজির মতের বিরুদ্ধে গিয়ে এষা সিনেমাতে অভিনয় শুরু করেন। এর ফলে প্রায় ছ'মাস হেমাজি আর ধরমজি একে-অপরের সঙ্গে কথা বলেননি!

ছবির নাম ছিল 'কোই মেরে দিল সে পুছে'। ছবিটি হিট হয় এবং নায়িকা হিসেবে এষা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ধীরে-ধীরে যখন এষা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে, তখন ধমরজির মন গলতে শুরু হয়। তবে আমার একটা ব্যক্তিগত ধারণা আছে। এষার ডেবিউ ছবিতে জয়া বচ্চনও অভিনয় করেছিলেন। আর জয়াজির সঙ্গে ধরমজির সখ্যর কথা সকলেরই জানা। তাই হতে পারে জয়াজি এষার সঙ্গে কাজ করার পর হয়তো ধরমজিকে বলেছিলেন যে এষা খুব ভাল কাজ করেছে। এটাই ওর জন্য সেরা পেশা। আর তাই হয়তো ধরমজিও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

নাচ দেখতে লজ্জা

অনেকেই হয়তো ভাববেন যে, ধরমজি যেহেতু এষার সিনেমাতে আসার ব্যাপারে এতটা রক্ষণশীল ছিলেন, তিনি হয়তো

হেমাজিকেও অভিনয় করতে দিতে চাইতেন না। কিন্তু সেটা একেবারেই ঠিক নয়। হেমাজির নাচ, গান, অভিনয়, রাজনীতি... সবকিছুকে ধরমজি সমর্থন করতেন। এষা বয়সে অনেকটা ছোট বলে হয়তো উনি মেয়েকে নিয়ে ভয় পেতেন আর যে কোনও বাবা-ই তার মেয়েকে নিয়ে পজেসিভ হয়। হেমাজি এমনিতে খুব স্ট্রং মহিলা ছিলেন। তিনি আলাদা করে কারও সাপোর্টের অপেক্ষায় থাকতেন না। তাই, ধরমজির কাছ থেকে তিনি সমর্থন প্রত্যাশা না করলেও, ধরমজি বরাবর সেই সমর্থন দিয়ে এসেছেন। সেই জায়গা থেকে ধরমজি খুব অনুপ্রেরণাদায়ক ছিলেন। এমনকি বিয়ের পরপরও হেমাজি কিন্তু কখনও কোনও কাজে ধরমজির কাছ থেকে বাধা পাননি। এষা-অহনার জন্মের পর হেমাজি নিজেই কাজ থেকে একটা সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন। তারপর আবার স্বমহিমায় হেমাজি কামব্যাক করেন। আর ধরমজি জানতেন, হেমাজিকে বাধা দিয়ে লাভও হবে না। উনি এতটাই স্বাধীনচেতা। এই জুটি একে-অপরের জন্য পরিপূরক ছিল। হেমাজির কাছে আর একটা মজার কথা শুনেছিলাম। ধরমজি নাকি মঞ্চে



মা-মেয়ে জুটি। একসঙ্গে এষা ও হেমা

হেমাজি বরাবর বলতেন, ধরমজির বাইরে থেকে যেরকম ইমেজ ছিল, ভিতরের মানুষটা নাকি একেবারে অন্যরকমের ছিল। বাইরে যতটা শক্ত ভিতরে ছিলেন ততটাই নরম।



ছোট এষাকে কোলে নিয়ে ধর্মেন্দ্র ও হেমা

ওঁর নাচ দেখতে খুব লজ্জা পেতেন। হেমাজি বরাবর বলতেন, ধরমজির বাইরে থেকে যেরকম ইমেজ ছিল, ভিতরের মানুষটা নাকি একেবারে অন্যরকমের ছিল। বাইরে যতটা শক্ত, ভিতরে ততটাই নরম। ধরমজি নাকি স্টেজে হেমাজিকে নাচতে দেখতে খুব লজ্জা পেতেন! আর তাই হেমাজিও দুষ্টুমি করে ইচ্ছে করে ধরমজিকে বারবার নিজের স্টেজ শোয়ে ডাকতেন। ধরমজি কোনও কাজের অজুহাত দেখিয়ে একেবারে শেষের দিকে যেতেন।

ফার্মহাউজ়ের সাদা ঘি

ধরমজি খুব খাদ্যরসিক ছিলেন। ওঁর আর হেমাজির মধ্যে একটা মজার বিষয় ছিল, হেমাজি স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান ছিলেন আর ধরমজি নন-ভেজ ছাড়া খেতে পারতেন না! কিন্তু আমি দেখেছি ও শুনেছি, ধরমজি যখন হেমাজির বাড়িতে থাকতেন তখন উনি নন ভেজ খেতেন না। তবে পরবর্তীকালে বয়স হওয়ার পর অবশ্য শরীরের জন্য নন ভেজ খাওয়া ছেড়ে দেন। ধরমজি কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে সবকিছু অর্গানিক খেতেন, তাও আবার ওঁর নিজের ফার্মহাউজ়ের। আমি বরাবর হেমাজির বাড়িতে যখনই লাঞ্চ বা ডিনার করেছি, উনি আগে গরম ভাতের সঙ্গে সাদা ঘি দিতেন। ওঁর মুখেই শোনা যে, ওই ঘি খাওয়া নাকি খুব হেলদি এবং ওটা পঞ্জাবে ধরমজির ফার্মহাউজ় থেকে আসত। একেবারে পিয়োর ঘি, যা শরীরের পক্ষে নাকি খুব ভাল, গুড কোলেস্টেরল সমেত। ধরমজি নিজেও রোজ গরম ভাতে ওই ঘি খেতেন। একবার মনে আছে, হেমাজির বাড়িতে গিয়ে দেখি বাড়িভর্তি সবজি সাজানো। দেখলে মনে হবে কেউ বুঝি বাড়ির মধ্যে সবজির দোকান

দিয়েছেন! আমি তো অবাক। এত সবজি! হেমাজি জানান, ওগুলো সব ধরমজির ফার্মহাউজের, সব অর্গানিক। এষা সেই সময় প্রেগন্যান্ট। মেয়ে যেন সব পিয়োর সবজি খেতে পায় তাই ধরমজি ভোরবেলা উঠে, গাছ থেকে সব সবজি পেড়ে নিয়ে এসেছিলেন। কতটা পিতৃস্নেহ ভাবুন! ধরমজির বাড়ি থেকে আর একটা খাবার আসত, কাঁচা আমের আচার। সঙ্গে হেমাজির খুব প্রিয় ছিল ধরমজির বাড়ির লস্যি আর মুলি কী পরাঠা। ওঁদের বাড়িতে জোয়ান দিয়ে মুলি কা পরাঠা হত, যাতে মুলো খেয়ে হজমের কোনও সমস্যা না হয়। আর দেড় লিটারের পিতলের পাতিয়ালা গ্লাসে লস্যি দেওয়া হত। লস্যির ৩০ শতাংশ-ই মালাই থাকত। আমি যখন 'বিয়ন্ড দ্য ড্রিমগার্ল' লিখছিলাম, ধরমজির বাড়ি গিয়ে প্রচুর আতিথেয়তা পেয়েছি। উনি এত খাবার দিতেন যে, আমি ঘাবড়ে যেতাম।



■ ছবির শুটিং সেটে একটা আলাদা বন্ডিং ছিল দু'জনের

এষা সেই সময় প্রেগন্যান্ট। মেয়ে যেন সব পিয়োর সবজি খেতে পায় তাই ধরমজি ভোরবেলা উঠে, গাছ থেকে সব সবজি পেড়ে নিয়ে এসেছিলেন।



ধরমজি হেসে বলতেন, "আজকাল কী নওজওয়ান কা ইয়েহি প্রবলেম হ্যায়। খানে সে পহলে হি বোলতে হ্যায় পেট ভর গয়া।" উনি গল্প করতে এত ভালবাসতেন যে, আমার বইয়ের জন্য হেমাজির প্রসঙ্গে বললেও আরও নানা বিষয় নিয়ে গল্প জুড়ে দিতেন। আর উনি যেন গল্পের পাহাড়! প্রচুর অভিজ্ঞতা...আপনি যদি দু'ঘণ্টা কথা বলেন, যে পরিমাণ তথ্য পাবেন, তা লিখে শেষ করতে পারবেন না। কথা প্রসঙ্গে সুপ্রিয়া দেবী, সুচিত্রা সেন, সকলের প্রসঙ্গ ওঠে। গুলজার, সুচিত্রা সেন, অসিত সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বিমল রায় ও ধরমজির মধ্যে একটা দারুণ বন্ডিং ছিল। ধরমজি বাঙালিদের খুব ভালবাসতেন। হেসে বলতেন, "পঞ্জাবে সবাই মারপিট করে, কৃষিকাজ করে, লাঙল চালায়। আর বাংলায় সকলে লেখাপড়া করেন, গান। বাংলার সাহিত্য, গানই আমাকে অভিনেতা বানিয়েছে।" 'বন্দিনী' বা বিমল রায়ের সাদাকালো ছবিগুলি থেকে উনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। উনি যে ভাল বাঙালি পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তা বরাবর স্বীকার করতেন। উনি বোধহয় একমাত্র বলিউড অভিনেতা যিনি সুপ্রিয়া দেবী ও সুচিত্রা সেনের সঙ্গে হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। সুনীত মজুমদার যখন 'লালপাথর' (রিমেক) করবেন বলে ভাবছেন, তখন উনি চাইলেন, হেমা মালিনী যদি সুপ্রিয়া দেবীর চরিত্রটি করেন আর রাজ কুমারের চরিত্রটি করুন উত্তমকুমার। তখন হেমাজি সব গ্ল্যামারাস চরিত্র করেছেন। সেখানে একজন বাল্যবিধবার চরিত্র খুবই চ্যালেঞ্জিং। উনি বুঝতে পারছিলেন না, করবেন কি করবেন না। ধরমজি এই ঘটনা শুনে বলেন, 'এটা তো

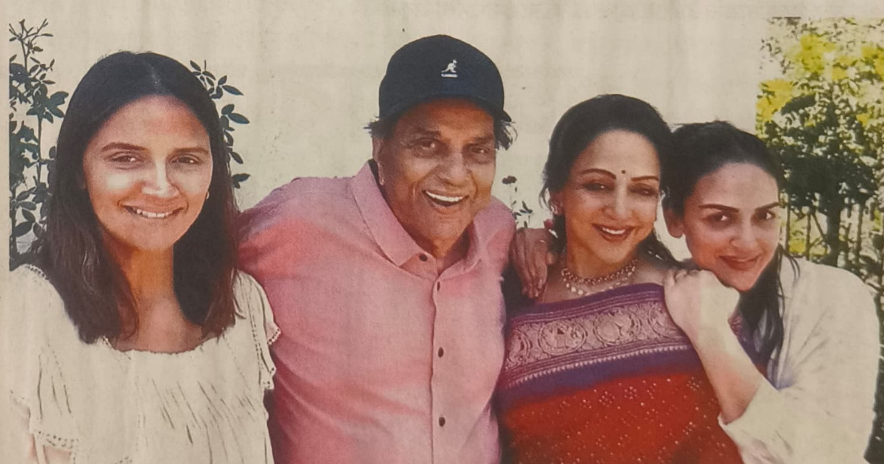


একটি গানের দৃশ্যে ধর্মেন্দ্র ও হেমা



ধর্মেন্দ্রর বাড়িতে সস্ত্রীক রামকমল

ধরমজির আর একটা বিশেষত্ব ছিল, ওঁর শায়েরি। উনি বিশুদ্ধ উর্দুতে শায়েরি বলার পর সহজ হিন্দিতে বুঝিয়ে দিতেন। ওঁকে বলতাম, আপনি...



ছুটি কাটাতে গিয়ে দুই মেয়ে ও স্ত্রী হেমার সঙ্গে ধর্মেন্দ্র

উত্তম-সুপ্রিয়ার ছবি!' তারপর পরিচালককে বললেন, মুম্বইতে এসে বাংলা ছবিটার স্ক্রিনিং করতে। মুম্বইতে স্ক্রিনিং হল। বাংলা ছবিটা দেখার পর হেমাজি ছবিটা করতে রাজি হন। ধরমজির আর একটা বিশেষত্ব ছিল, ওঁর শায়েরি। উনি বিশুদ্ধ উর্দুতে শায়েরি বলার পর সহজ হিন্দিতে বুঝিয়ে দিতেন। ওঁকে আমি বলতাম, আপনি কেন কবিতার সংকলন বার করছেন না? তখন উনি বলতেন, "হর চিজ় জো হম খুদ কে লিয়ে লিখতে হ্যায়, উয়ো থোড়ি বাজ়ার মেঁ নিলাম হোতা হ্যায়!" হেমাজির 'দ্রৌপদী' দেখতে গিয়ে ধরমজি খুব ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলেন। 'রাধাকৃষ্ণ' দেখে উনি বলেছিলেন, 'স্টেজে হেমাকে দেখছি, না রাধাকে দেখছি বোঝা মুশকিল।'

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো বটেই, কিন্তু সেই সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্বের গণ্ডিটা খুব সুন্দর ভাবে নিজেরা পালন করেছেন হেমাজি ও ধরমজি। আসলে ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী শুধু জুটি নন, ওঁরা একটা ইমোশন। এখনও গ্রাম থেকে পালিয়ে সিনেমা করতে এলে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন, হেমা মালিনী বা ধর্মেন্দ্রর মতো হওয়ার। হেমাজি বরাবর ধুমধাম করে নিজের জন্মদিন সেলিব্রেট করেন। এবার ধরমজি অসুস্থ ছিলেন বলে সেই পার্টি আর হয়নি। কিন্তু হেমাজি জানান, জন্মদিনের দিন নিজের রুমে ঢুকে দেখেন সেখানে দুটো বিশাল ফুলের তোড়া রাখা। একটি এসেছে ধরমজির কাছ থেকে, আর একটি সানি দেওলের কাছ থেকে। লিলি, ল্যাভেন্ডার, গোলাপ ছিল ধরমজির পাঠানো তোড়ায়। আর সানির ফুল ছিল ইম্পোর্টেড সানফ্লাওয়ার। আমার খুব আক্ষেপ ধরমজি-হেমাজিকে একসঙ্গে কোনও ছবিতে ব্যবহার করতে পারলাম না!



■ ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে সাতটি ছবিতে অভিনয় করেছেন শর্মিলা ঠাকুর

আমার বন্ধু ধরম

একই দিনে জন্মদিন তাঁদের। সেই সূত্রে একটা ভাল যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল **ধর্মেন্দ্র**র সঙ্গে। আজ ভীষণ মনে পড়ছে সেই বন্ধুর কথা। স্মৃতি উজাড় করলেন **শর্মিলা ঠাকুর**

বেশ কয়েকবছর আগের কথা। তখন আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বেডে শয্যাশায়ী। সেখানেই একদিন আই প্যাডে হৃষিদার (হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়) 'চুপকে চুপকে' ছবিটা দেখছি। শরীর খারাপের মধ্যেও মনটা এক নিমেষেই যেন ভাল হয়ে গেল! ধরমের অভিনীত 'পরিমল ত্রিপাঠী'কে দেখে তো না হেসে থাকা যায় না! এত অনবদ্য কমিক টাইমিং ওর। তারপর ছবি দেখা শেষ করেই সোজা ধরমকে ফোন। ও তো অবাক! ওই ছবির শুটিংয়ের নানা স্মৃতির রোমন্থন চলল দু'জনে। সেদিন খুব খুশি হয়েছিল আমি ফোন করায়। তবে আমার শরীর খারাপের কথা তো জানত না, উদ্বিগ্ন হয়ে সবিস্তার খোঁজ নিল। এমনিতে ওর স্বভাবটাই তো ছিল খুব কেয়ারিং। চারপাশের সবাইকে ভাল রাখতে জানত।

সাতটি ছবি আমি করেছি ধরমের সঙ্গে। তার মধ্যে সবার আগে রাখব 'সত্যকাম', 'অনুপমা' এবং অবশ্যই 'চুপকে চুপকে'— হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের এই তিনটি ছবিকে। আবার এই তিনের মধ্যে 'চুপকে চুপকে' ছবিতে ওর কাজের তো কোনও তুলনাই হয় না। আগেও বলেছি যে, আমার মতে ধরমের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল 'চুপকে চুপকে' ছবির অভিনয়ের জন্য। কিন্তু কমেডি অভিনয়ের জন্য বোধহয় বিবেচনা করা হত না কোনও সেরার পুরস্কার। তাই ও বঞ্চিত থেকেছে। পুরস্কার পাক বা না পাক, আমার মনে হয় যাঁরা ওঁর অভিনয়



■ 'সত্যকাম' ছবিতে শর্মিলার সঙ্গে ধর্মেন্দ্র

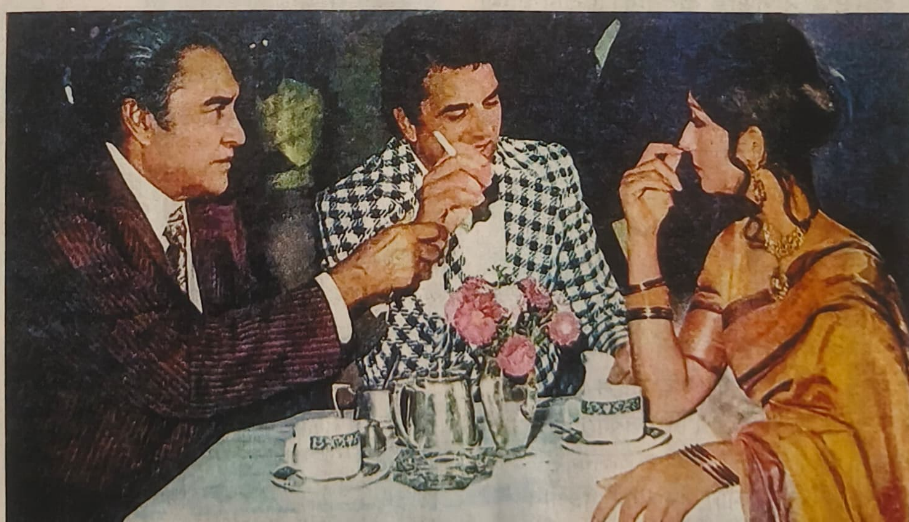
ভালবাসেন, তাঁদের এই ছবিটা আজ আরও একবার দেখা উচিত, মূল্যায়ন করা উচিত। আসলে যে-কোনও ধরনের রোলে ধরম নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত, তা অ্যাকশন ছবি হোক, কমেডি অথবা আবেগদীপ্ত নরম স্বভাবের চরিত্র।

আশা করি ধরমের অভিনেতা সত্তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এক সময় হবে। শুধুমাত্র 'অ্যাকশন হিরো' বা 'হি ম্যান' ইমেজ ওর সঙ্গে যে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল, তার বিপরীত চরিত্রেও ও অনেক কাজ করছে, তার মধ্যে আমার সঙ্গে অভিনীত তিনটি ছবির কথা আগেই বললাম। আমরা একসঙ্গে কাজ শুরু করেছিলাম ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'দেবর' ছবি থেকে। ধরমের প্রথম হিট ছবি ছিল মীনা কুমারির সঙ্গে 'ফুল অওর পত্থর'। তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ওকে। কত ধরনের ছবিতে কত ধরনের অভিনয় যে করেছে, তার ইয়ত্তা নেই! সম্প্রতি 'অনুপমা' ছবিটি আবারও দেখছিলাম। কী সংযত অভিনয়, প্রতিটি সংলাপ উচ্চারণে কী অনায়াস যত্ন! ও নরম, আবেগী ভূমিকায় কাজ করে গিয়েছে দিনের পর দিন, কখনও ভাবেনি যে, ওর 'হি ম্যান' ইমেজে তা কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অনেক হিরোকেই দেখেছি, আজীবন 'হিরো' হয়েই থাকতে চান, মনে করেন ভিলেনের হতে মার খেলে অথবা নরম গোবেচারা চরিত্রে কাজ করলে তাঁর হিরোগিরি লঘু হয়ে যাবে। ধরম এ সব কখনও ভাবেনি। 'সত্যকাম' চরিত্রটি তো সব হারিয়ে ফেলছে বাইরের দিক থেকে। অনেক তথাকথিত হিরো এই চরিত্র করবে না। ধরম শুধু করত তাই নয়, প্রচুর পরিশ্রম করত এই ধরনের রোলে, এই ধরনের কাজকে অগ্রাধিকারও দিত। আজ 'অনুপমা' ছবিতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা ওর সংলাপ মনে পড়ছে — 'আমি বলেছি, আমার দরজা চিরকাল ওর জন্য খোলা থাকবে। কিন্তু ওকে নিজের সিদ্ধান্তে ওর বাড়ি থেকে হেঁটে আমার বাড়িতে আসতে হবে। আমি জোর করব না...'

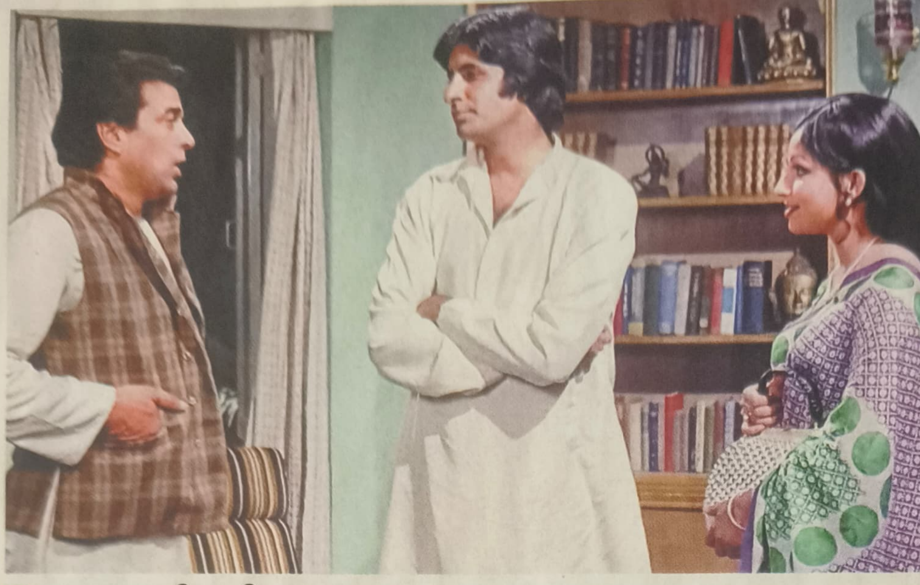
স্টারসুলভ আচরণ?

হৃষিদার সঙ্গে ধরমের রসায়ন ছিল অনবদ্য। উনিও খুব ভালবাসতেন ধরমকে। প্রয়োজনে বকাঝকা করতেন, পিছনে লাগতেন আর অন্যদিকে ধরম অসম্ভব শ্রদ্ধা করত হৃষিদাকে। একবার ওর দেরি হয়ে গিয়েছিল সেটে আসতে, হৃষিদা শুটিং শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্যস, আর কখনও ওকে ফ্লোরে আসতেদেরি করতে দেখিনি।

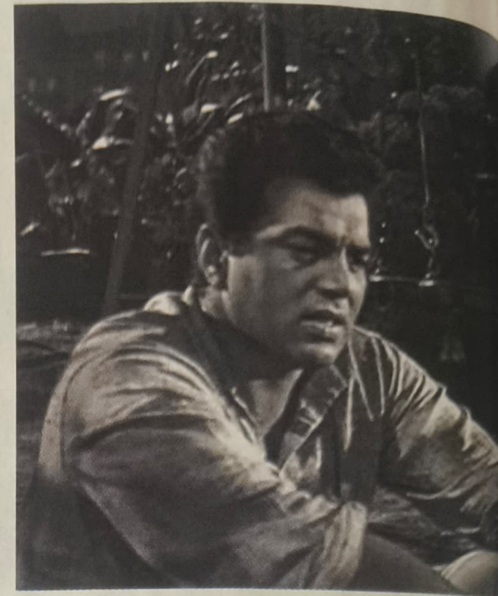
এই দেরিতে আসার বিষয়টি এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার। সে সময় হিরোদের রেওয়াজই ছিল একটু দেরিতে ফ্লোরে আসা! কাকা (রাজেশ খন্না) হরিভাই (সঞ্জীবকুমার) কখনও সময়ে আসতেন না। সবসময় দেরি করে আসাটাই যেন ছিল দস্তুর। শত্রুঘ্ন সিনহা তো বাড়িতে বসেই দেরি করতেন! শশী কপূরকে কখনও দেরি করতে দেখিনি, আর দেখিনি ধরমকে। কাজের প্রতি এতটাই ফোকাস ছিল ওঁদের। এই প্রসঙ্গে অমিতাভ বচ্চনের নিয়মানুবর্তিতার কথা সবাই জানেন। আমাদের সবার আগে সেটে চলে আসত তো বটেই, অনেক সময় এমনও হয়েছে, ফ্লোর সাফ করতে যারা আসবেন, তাঁদেরও আগে চলে এসেছে অমিতাভ! ধরম ছিল ডিরেক্টরস অ্যাক্টর, ওকে নিয়ে কোনও পরিচালক কোনও



■ অশোককুমারের সঙ্গে একটি পার্টিতে ধর্মেন্দ্র-শর্মিলা



'চুপকে চুপকে' ছবিতে অমিতাভের সঙ্গে দু'জনে



উদার মনের মানুষ ছিলেন ধরম



১৯৬৭ সালে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের টেস্ট ম্যাচ দেখতে ইডেন গার্ডেনসে শর্মিলা

সমস্যায় পড়েছেন, এমনটা কখনও শুনিনি। নিজে দেখিওনি। আমি নিজে মাঝে মধ্যেই ধৈর্য হারাতাম কিন্তু মনে পড়ে না, সেটে কাজ চলাকালীন কোনও দিন ধরমকে মেজাজ হারাতে বা চিৎকার চেঁচামেচি করতে দেখেছি বলে। সবাইকে সমান গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে কথা বলাটাও ওর কাছে শেখার। শুধু আমার সঙ্গে নয়, আমার হেয়ারড্রেসার, মেক আপ ম্যান, নতুন কাজ করতে আসা আর্টিস্টদের সঙ্গেও সবসময় সমান ভাবে কথা বলতে দেখেছি ওকে।

উদার মানুষ, উদার মন

শিল্পী ধরমের পাশাপাশি মানুষ হিসেবে ওর দরিয়া দিল, উদার, বন্ধুত্বপূর্ণ, মানবিক দিকটাও মনে পড়ছে বারবার। একটা ঘটনা আমার মনে গোটা জীবনের জন্য দাগ কেটে গিয়েছিল। ছয়ের দশকের শেষে মুম্বইয়ে তখন আমার চরম ব্যস্ততা। ধরমও বড় তারকা হয়ে গিয়েছে। দুটো শিফটে চুটিয়ে কাজ করছি, সকাল সাতটা থেকে দুটো আবার দুটো থেকে দশটা। কেদার স্টুডিয়োতে চলছে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে আমার 'মেরা হমদম মেরা দোস্ত' ছবির কাজ। এরকমই এক সন্ধ্যায় অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় শিফটে 'ছলকা ইয়ে জাম' গানের শুট চলছে। এদিকে পরের দিন সকালেই আমার ইডেন টেস্ট দেখতে কলকাতা যাওয়ার টিকিট কাটা, যেখানে টাইগার (মনসুর আলি খান পটৌডি) ক্যাপ্টেন। এটা সেই ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট, যেখানে শেষ পর্যন্ত টিকিট বন্টন নিয়ে বিরাট গন্ডগোল হয়েছিল মাঠে, অর্থাৎ ১৯৬৭-র জানুয়ারির টেস্ট ম্যাচ।

যাওয়া তো ঠিক, কিন্তু রাতে নির্ধারিত শিফট-এর মধ্যে আমরা গানের শুটিং শেষ করতে পারলাম না। মনে-মনে প্রমাদ গুনলাম। তার মানে পরের দিনের আগে এই কাজ শেষ করার কোনও উপায় নেই। অথচ আমার কলকাতা যাওয়ার সব ঠিক। কী করি এখন?

উপায়ান্তর না দেখে সোজা ধরমের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলাম, যদি আজ রাতে বাড়তি কাজ করে শটটা শেষ করে দেওয়া যায়, তাহলে আমি কাল কলকাতা যেতে পারি। ও এক কথায় রাজিই হল শুধু না, মাঝে মাঝে মেক আপ রুমে গিয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে গোটা রাত পরিশ্রম করে শেষ করল শুট। আমরা যখন প্যাক আপ করছি তখন ঘড়িতে বাজে সকাল সাতটা! আমি ফ্লোর থেকেই সরাসরি দৌড়োলাম এয়ারপোর্ট। আমার দীর্ঘ কেরিয়ারে মনে করতে পারি না এমনটা কেউ করবেন তাঁর কো অ্যাক্টরের জন্য। অন্যের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, আমি নিজেই তো করব না এটা কখনও কারও জন্য! ধরম বলতেই পারত, 'তুমি খেলা দেখতে যাবে বলে আমি সারা রাত কাজ করতে পারব না।' তারও তো পরের দিন শেডিউল রয়েছে। এতটাই বড়



মন ছিল ধরমের, অন্যদের জন্য সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত।
মনে পড়ছে, 'সত্যকাম'-এর শ্যুটিংয়ের সময় ঘাটশিলাতে হওয়া একটা ঘটনার কথা। আমি নদীর পাড়ে একটা গানের শুট করছি। জায়গাটা একটু ঢালুতে। ইউনিটের সঙ্গে কী কারণে বচসা হওয়ায় একদল গুন্ডা ধরনের লোক জড়ো হয়েছে, উত্তেজনা বাড়ছে। তারপর পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় সেই জনতা উপর থেকে ঢিল ছুড়তে শুরু করে আমাদের দিকে। সেদিন বুক চিতিয়ে সব সামলে আমাকে এবং আমাদের ইউনিটকে সুরক্ষিত করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল ধরম। ওর সেই ভূমিকা কখনও ভুলব না।
বহু কথা আজ মনে ভিড় করে আসছে। আমার আর ওর একই দিনে জন্মদিন, ৮ ডিসেম্বর। যদিও ও আমার চেয়ে দশ বছরের বড়, কিন্তু আমাদের একটা সংযোগ

আমার আর ওর একই দিনে জন্মদিন, ৮ ডিসেম্বর। যদিও ও আমার চেয়ে দশ বছরের বড়, কিন্তু আমাদের একটা সংযোগ ছিল এই দিনটির মাধ্যমে। ধরম ফোন করত। খবর নিত



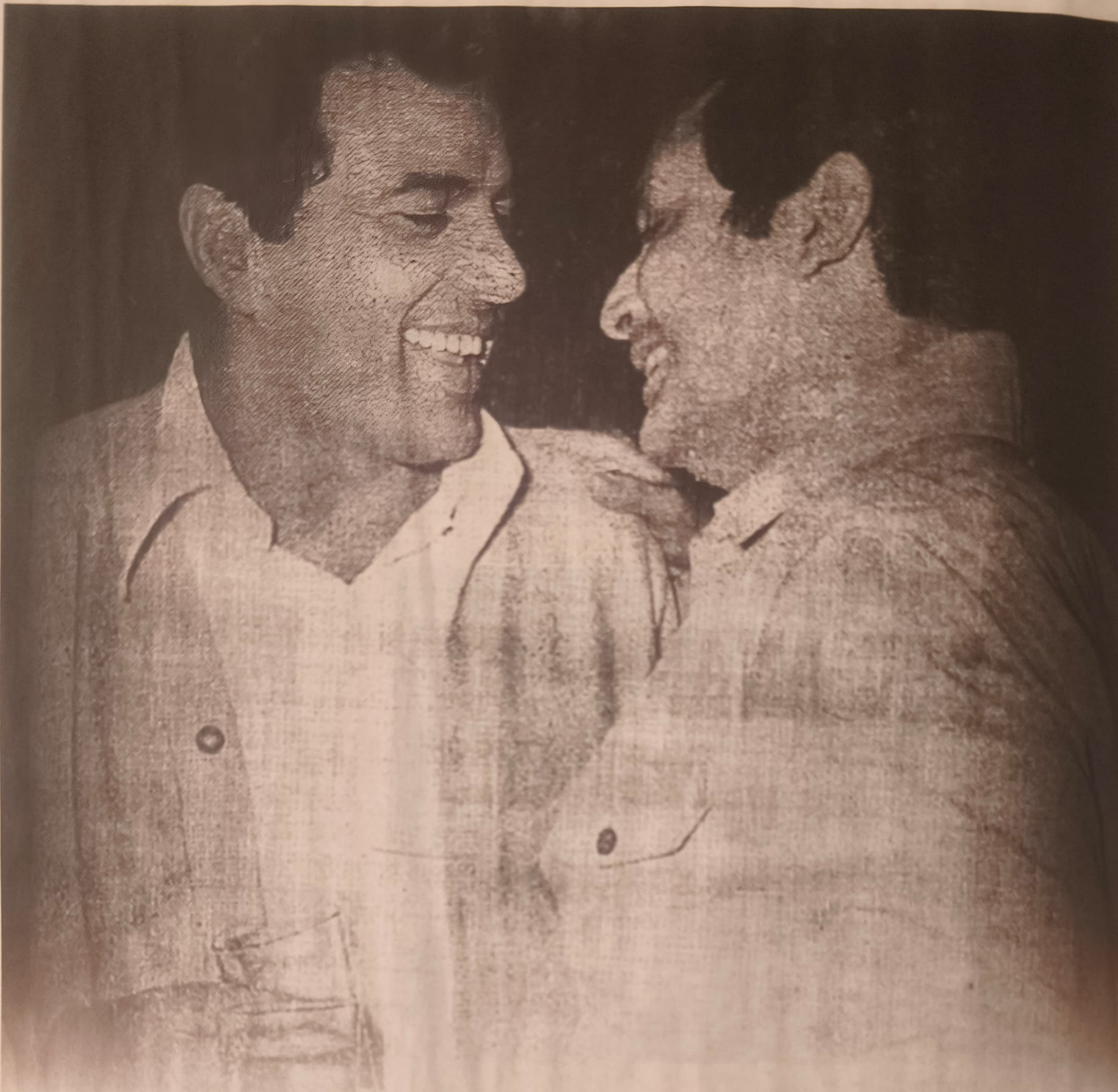
শুটিংয়ের ফাঁকে দু'জনের গল্প



তাঁদের দু'জনের ছবি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে সবসময়

ছিল এই দিনটির মাধ্যমে। শুধুমাত্র বড় তারকা এবং অভিনেতাই তো শুধু নয়, ধরম ছিল অসম্ভব বড় মনের একটা মানুষ। বৃহত্তর পরিবারকে আগলে রাখত পিতার মতো। শুধু নিজের সন্তানদের নয়, ভাই বোনেদের ছেলে মেয়েরাও ওকে বাবার মতোই দেখত। 'পাপাজী' বলে ডাকত সবাই। এরকমই ওর কোনও নিকটাত্মীয় একবার ওর কাছে আমার অটোগ্রাফ চেয়ে রেখেছিল। বেশিদিন আগের কথা নয়, তখন আর কাজের সূত্রে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হয় না। আজ পাঠাব, কাল পাঠাব করে আমার আর কাগজে সই করে পাঠানো হচ্ছিল না। ধরম মাঝে মাঝেই তখন আমাকে ফোনে তাগাদা দিত, 'প্লিজ় দেরি করো না বেচারি অপেক্ষা করছে, পাঠিয়ে দাও!' আমি সেটা পাঠানোর পর, খুব খুশি হয়েছিল।
করণ জোহরের 'রকি আউর রানি কি প্রেম কাহানী' ছবিতে আমার কাজ করার কথা ছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সে সময় একে কোভিড চলছে, সঙ্গে আমার নিজের অসুস্থতা। কো-মর্বিডিটির ঝুঁকি ছিল, আমার চিকিৎসকও যাত্রী-বিমানে করে মুম্বইয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিশে কাজ করতে নিষেধ করলেন। ফলে আমার আর ওই কাজটা করা হয়নি। আজ আফশোস হচ্ছে। ধরমের সঙ্গে আবারও একটা কাজ করতে পারলে আরও কিছু স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে থাকত আমার কাছে।

অনুলিখন: অগ্নি রায়



দুই নায়ক, দুই বন্ধু

তাঁরা একইসময়ে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলেন। তাই অনেকেই ভাবতেন তাঁদের মধ্যে মারাত্মক রেষারেষি রয়েছে। তবে আদতে তাঁরা ভাল বন্ধু ছিলেন। **ধর্মেন্দ্র**র সঙ্গে নিজের সম্পর্কের গল্প শেয়ার করলেন বলিউডের প্রথম বাঙালি সুপারস্টার **বিশ্বজিৎ**

বলা হয়, কারও মৃত্যুর খবর রটে গেলে সে নাকি অনেকদিন বাঁচে। আমিও খুব আশা করেছিলাম যে আমার প্রিয় বন্ধু ধর্মেন্দ্রও হয়তো আরও অনেকদিন বাঁচবে। ভেবেছিলাম, এবারের জন্মদিনে ওর কাছে যাব, ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করব, জন্মদিনের কেক খাওয়াবো। কিন্তু সেসব আর কিছু করা হল না। আমি আর ধরম প্রায় একই সময়ে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলাম। অনেকেই ভাবতেন আমার সঙ্গে ধরমের বুঝি খুব খারাপ সম্পর্ক। কেরিয়ার নিয়ে আমাদের মধ্যে রেষারেষির কথা বহু পত্র-পত্রিকায় ছাপা হত। কিন্তু সেসব শুধুই গসিপ ছিল। আপনি যদি পেশাদার জগতের কথা ধরেন, তাহলে আমাদের ইমেজ কিন্তু একেবারে আলাদা-আলাদা ছিল। ওঁর ইমেজটা ছিল হি-ম্যান টাইপের। আর আমার ছিল মিউজিক্যাল, রোম্যান্টিক ধাঁচের। তাই



■ 'ইয়ে দিল দিওয়ানা হ্যায়' ছবিতে সাধনা, ধর্মেন্দ্র ও বিশ্বজিৎ

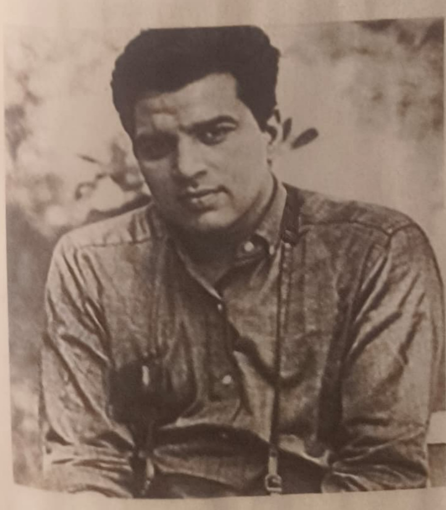
এরকম বন্ডিং! আমরা মন খুলে আনন্দ করতাম। কে ক'টা ছবি পেল, তা নিয়ে কুৎসা রটানো, পিছনে কথা বলা, এগুলো সে সময়ে আমাদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। স্ক্রিন লাইফের চেয়ে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও আবেগের জায়গাটা আমাদের অনেকবেশি শক্ত ছিল।

আমার বাড়ির রান্না ওর প্রিয় ছিল। এমনও কতদিন হয়েছে যে ধরম আমার বাড়িতে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, খাওয়াদাওয়া করে আমার বেডরুমেই শুয়ে পড়েছে।

আমাদের মধ্যে কিন্তু কোনও তুলনা চলে না। তাও মানুষ কেন এটা করতেন জানি না। ক্যামরার সামনে আমরা দু'জনেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করতাম।
অশোককুমার, বলরাজ সাহানি বা রাজকুমার যেই হোন না কেন, কাউকেই এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিইনি। কিন্তু ক্যামেরার বাইরে ধরম আমার খুব খুব প্রিয় বন্ধু ছিল। প্রথম আলাপেই আমাদের মনের মিল হয়ে যায় এবং আমাদের মধ্যে একটা দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ধরমের সিম্পলিসিটি, শো অফ না করা, কোনওরকম ছলচাতুরিতে না থাকা, স্পষ্টবাদী স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কারণ আমিও অনেকটা ওর মতোই ছিলাম।
মুম্বইতে আমার বাড়িটা ছিল প্রাসাদের মতো। কিন্তু মানুষ ছিলাম আমি একা। তাই আমার বাড়িতে অনেকেই চলে আসতেন। নিয়মিত পার্টি হত, আড্ডার আসর বসত। আমার



■ একসঙ্গে তাঁরা একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন

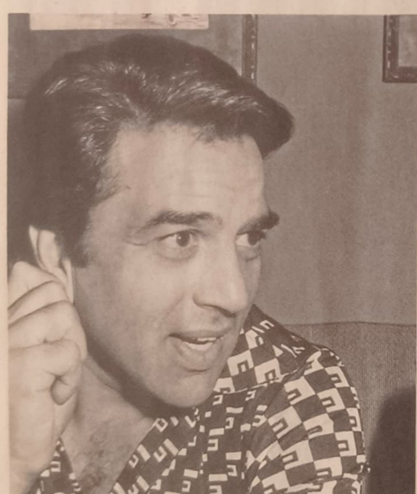


বাড়ির পার্টিতে ধরম ছিল নিয়মিত অতিথি। এমনিতেও ও এত জলি স্বভাবের ছিল যে ধরম না থাকলে কোনও পার্টিই জমত না। শুধু আসরেই নয়, যখনই ইচ্ছে হত ধরম আমার বাড়িতে চলে আসত। ও খাবার খেতে ও ড্রিঙ্ক করতে খুব পছন্দ করত। আর আমার বাড়ির কুকের রান্না ওর প্রিয় ছিল। এমনও কতদিন হয়েছে যে, ধরম আমার বাড়িতে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, খাওয়াদাওয়া করে আমার বেডরুমেই শুয়ে পড়েছে। সানি তখন ছোট। ও জানত বাবা বাড়ি না ফেরা মানেই বিশ্বজিৎ আঙ্কলের বাড়িতে আছে! এসব এখন ভাবতে পারবেন? দু'জন সমসাময়িক নায়কের মধ্যে এরকমও হয়েছে, আমার খুব জ্বর। যেহেতু একা থাকতাম, বাড়ির কাজের লোক বাদে আর দেখাশোনার কেউ নেই। ধরম শুট সেরে আমার বাড়িতে চলে এসেছে। সারারাত আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, আমাকে জলপট্টি দিয়েছে। সবসময় অন্যের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াত। এত বড় মনের মানুষ ছিল। আবার আমিও যখন-তখন ওর বাড়ি চলে যেতাম। গেট পেরোলেই ওর বাবুজি বলতেন, 'ধরম ভিতরে আছে চলে যাও'। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ না করে ছাড়ত না। আমার আর ধরমের মধ্যে আর একটা কমন লিঙ্ক ছিল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও ভগৎ



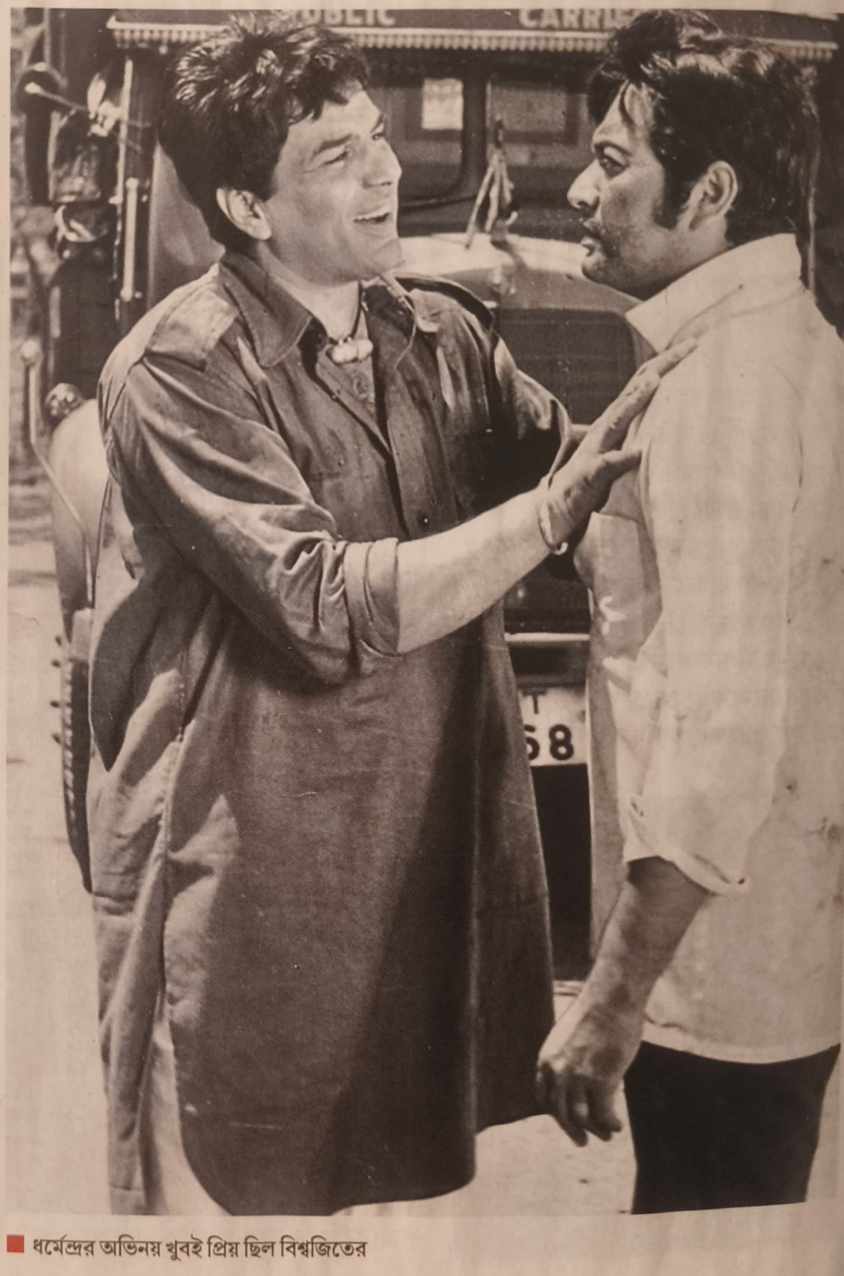
■ ‘কেহতে হ্যায় মুঝকো রাজা’ ছবির পোস্টার

আমি মদ্যপান করেও ঠিক থাকতাম, সেন্স হারাতাম না। তাই ধরম আমাকে ‘বাঙালি জাঠ’ বলে ডাকত! আমার ছোট মেয়েকে শাস্তাবীকেও ভালবসত।

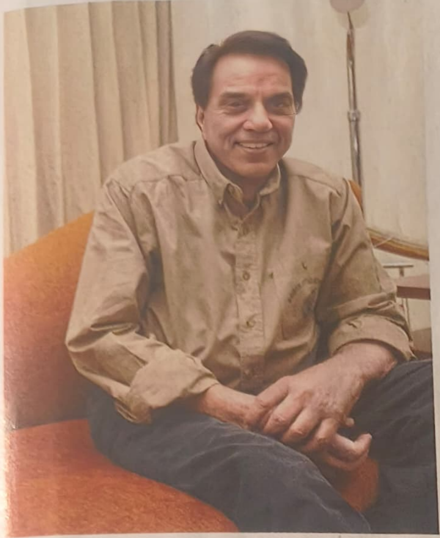


সিংহের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান। নেতাজীর কথা উঠলেই ও উঠে দাঁড়াত। পঞ্জাবের এক প্রত্যন্ত গ্রামে ও বড় হয়েছে। হাল চালাত, সেখান থেকে বলিউডে রাজত্ব করেছে। এটা বড় দৃষ্টান্ত। ধর্মেন্দ্র একজনই হয়। আমার নিজস্ব ব্যানারের ছবিতে ধর্মেন্দ্র কাজ করেছে, ঋত্বিক ঘটকের ডকুমেন্টারিতেও ও ছিল। আমার সাম্প্রতিক ছবি ‘অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার’এও অভিনয় করেছে। সিনেমায় লালা লাজপত রাইয়ের চরিত্রে কোনও বডি ডাবল ছাড়াই ও অভিনয় করেছে। এই বয়সে অমন কাজ আমিও ভাবিনি। শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওর খুব ইচ্ছে ছিল ছবিটা দেখার, কিন্তু দেখাতে আর পারলাম না। ওর সহকারী আমাকে বলত, ওর শরীরটা ভাল নেই। একটু সুস্থ হলেই দেখবেন।

ফিল্মি পার্টিগুলোতে আমার একটা বৈশিষ্ট ছিল। আমি প্রচুর পরিমাণ মদ্যপান করেও ঠিক থাকতাম, সেন্স হারাতাম না। তাই ধরম আমাকে ‘বাঙালি জাঠ’ বলে ডাকত! আমার ছোট মেয়ে শাস্তবীকে ধরম খুব ভালবাসত, একেবারে নিজের মেয়ের মতো। ‘অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার’-এ আমার মেয়েও অভিনয় করেছে। ধরম শাস্তবীকে অনেক আশীর্বাদ করত।



■ ধর্মেন্দ্রর অভিনয় খুবই প্রিয় ছিল বিশ্বজিতের



আমার তিনটি প্রোডাকশনে কাজ করেছে ধর্মেন্দ্র। 'কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা' (ও আর হেমা মালিনী ছিল এবং ছবিটি আমি ডিরেক্ট করেছিলাম), ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় ডকুমেন্টারিতে এবং এই সাম্প্রতিক 'অগ্নিযুগ দ্য ফায়ার'। আর আমরা প্রায় সাতখানা ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছি, যার মধ্যে একটা বাংলা ছবিও ছিল। ধরম এই ইন্ডাস্ট্রিকে খুব ভালবাসত। সত্যিকারের খাঁটি মানুষ ছিল। ছোট-ছোট বহু প্রযোজককে প্রোমোট করেছে, তাদের ছবিতে অনেক কম টাকা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিয়েছে। এমনও হয়েছে যে, প্রযোজকের থেকে টাকা না নিয়ে উল্টে ছবির জন্য নিজের পকেট থেকে টাকা ঢেলেছে! টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের বিপদে সবসময় ওকে পাওয়া যেত আর তাই টেকনিশিয়ানরাও ধরমকে খুব শ্রদ্ধা করত। পঞ্জাবের মাটি থেকে উঠে আসা ছেলে তো, যে-কোনও অন্যায় দেখে রুখে দাঁড়াত। আমাকে কোনও বিষয়ে ধরম 'না' করতে পারত না। একবার মনে আছে, বন্যাত্রাণের জন্য কলকাতায় ফান্ড রেজিং শো করেছিলাম। সকলের ইচ্ছে ছিল যাতে ধরম ওই শো-তে যায়। সেই সময় ও দক্ষিণ ভারতে শুট করছে। আমার এক কথায় ও শুটিং থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে কলকাতায় সেই শো-তে চলে এসেছিল। আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, 'অগর মেরা লাশ না গির গয়া, তো ম্যাঁয় আউঙ্গা'। ওর মধ্যে দেশপ্রেম ছিল প্রবল। ভগৎ সিংহ, চন্দ্রশেখর আজ়াদের মতো লোকদের খুব সম্মান করত। একটাই জিনিস তৃপ্তির যে, ওর শেষ ছবি কিন্তু আমার পরিচালনায়। ২০২৬-এ মুক্তি পাবে 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার'। আমার চোখে অপারেশন হওয়ায় আমি ক্রিমেশন গ্রাউন্ডে যেতে পারিনি কিন্তু সানি-ববির বাড়িতে যাই। আবার হেমার কাছেও যাই। সানি-ববি আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দেয়। ওরা তো দেখেছে, ওদের বাবা আমার কত ক্লোজ় ছিল। ধরম তুমি যেখানেই থাকো, ভাল থেকো। উইশ ইউ আ ভেরি হ্যাপি বার্থডে।

আমার এক কথায় ও শুটিং থেকে কলকাতায় আমার শো-তে চলে এসেছিল। আমাকে বলেছিল, 'অগর মেরা লাশ না গির গয়া, তো ম্যাঁয় আউঙ্গা'।



'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার' ছবির সেটে অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ও পরিচালক বিশ্বজিৎ



ছবির সেটে শাম্ভাবীর সঙ্গে

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম



■ 'আয়া সাওয়ন ঝুম কে' ছবিতে ধর্মেন্দ্র-আশা পারেখ

আমার সুপুরুষ নায়ক

তাঁরা একসঙ্গে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। তবে শুধু পর্দায় নয়, পর্দায় বাইরেও তাঁদের একটা অটুট বন্ধুত্ব ছিল। **ধর্মেন্দ্র**-র স্মৃতিচারণায় **আশা পারেখ**

'আয়ে দিন বাহার কে', 'শিকার', 'আয়া সাওয়ন ঝুম কে', 'মেরা গাঁও মেরা দেশ', 'সমাধি'... ধরমজির সঙ্গে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছি। উনি ছিলেন আমার সবচেয়ে সুপুরুষ নায়ক। আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী, ধরমজির জন্য কী লেভেলের ফিমেল ক্রেজ় ছিল। শুটিংয়ে মহিলা ভক্তরা বরাবর ওঁকে ঘিরে ধরতেন। কেউ হাতে অটোগ্রাফ নিতেন, কেউ পিঠে! অনেকেই বলেন যে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে রাজেশ খন্না ছিলেন ফ্ল্যামবয়েন্ট নায়ক।



■ 'মেরা গাঁও মেরা দেশ' ছবিতে গানের দৃশ্যে দু'জনে

সকলের সঙ্গে বসে সেদিন ওখানেই ডিনার করেন। এই ছিল ধরমজির মন। কোনও রকম স্টারসুলভ বায়ানাক্কা ছিল না। আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। 'সমাধি' ছবির শুটিং চলছে। একটা দৃশ্যে আমার মৃতদেহ ধরে কাঁদবেন ধরমজি... এটাই ছিল সিন। কিন্তু সেদিন আমাদের দু'জনের বাড়িতেই ইনকাম ট্যাক্সের লোক অভিযান চালাতে এসেছিলেন। আমরা অনুমতি নিয়ে শুটিং করতে গিয়েছিলাম। তাই আমরা দু'জনেই খুব টেনশনে ছিলাম। এতটাই প্রেশারে ছিলাম যে, কিছুতেই সিনটা হচ্ছিল না। না ধরমজি কাঁদতে পারছিলেন, না আমি মৃতদেহ হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারছিলাম। সে এক দিন ছিল বটে! ধরমজি শুধু আমার সহ-অভিনেতা নন, আমার খুব কাছের বন্ধুও ছিলেন। ধরমজির কোমল স্বভাব এবং রসবোধ আমাদের প্রতিটি শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা

> মহিলারা ধরমজিকে গোলাপ ফুলে প্রায় মুড়ে দেন। ধরমজির জন্য নানারকম পদও রান্না করেছিলেন। উনি সেদিন ওখানেই ডিনার করেন।

কিন্তু আমি মনে করি ধরমজিও কিছু কম যেতেন না। একবার মনে আছে 'মেরা গাঁও মেরা দেশ'-এর শুটিং চলছে। মুম্বই থেকে দূরে একটি অঞ্চলে। সেখানে লোকজন খুব বিশেষ নেই। আমরা বেশ নিরিবিলিতে শুট করছিলাম। হঠাৎ একদল মহিলা, তাও প্রায় ৩০-৩৫ জন মিলে সেটে চলে আসেন! সকলেই মধ্যবয়স্ক, অধিকাংশই বিবাহিত। তাঁরা ধরমজিকে ঘিরে ধরে দাবি জানান যে, শুটিং স্পট থেকে তাঁদের বাড়ি মিনিট দশেকের। শুট সেরে ধরমজিকে সেখানে যেতে হবে। তাঁরা তাঁকে সংবর্ধনা দিতে চান। আমাকেও অবশ্য ডাকা হয়। আমি ভেবেছিলাম ধরমজি যাবেন না, কোনও রকমে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু শুট শেষে আমাকে গাড়িতে নিয়ে ওঁদের পাড়ায় ধরমজি যান। সেই মহিলারা ধরমজিকে গোলাপ ফুলে প্রায় মুড়ে দেন। শুধু তাই নয়, ওঁরা ধরমজির জন্য নানারকম পদ রান্না করেছিলেন। উনি কিন্তু



■ 'আয়ে দিন বাহার কে' ছবিতে তাঁদের অনস্ক্রিন রোম্যান্স তুমুল প্রশংসিত হয়

স্মরণীয় করে রাখত। আর ধরমজির বহুমুখী প্রতিভা আমাকে বরাবর মুগ্ধ করত। একদিকে বলিউডের হি-ম্যান হিসেবে তাঁর ইমেজ আর অপরদিকে রোম্যান্টিক ও কৌতুকপূর্ণ চরিত্র, সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন দুরন্ত। সেটে আমি আর ধরমজি থাকলে সবসময় হইহই করতাম। কিন্তু যে-ই ক্যামেরা অন হত, আমরা নিজেদের চরিত্রে ঢুকে যেতাম। আমার ফেভারিট ধরমজি-ফিল্ম হল হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'সত্যকাম'। ইন ফ্যাক্ট, হৃষিদার আর একটি ছবি 'চুপকে চুপকে'-তে আমার ধরমজির বিপরীতে অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আমাকে শেষ মুহূর্তে ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই নিয়ে ধরমজি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। আমার জন্য উনি নিজেও ছবিটা করবেন না বলেছিলেন। কিন্তু শেষে কোনওভাবে ওঁকে রাজি করানো হয়। এই ছিল আমাদের বন্ডিং। সেই সময় আমার সব ছবিই সুপারহিট হচ্ছিল। তাই ধরমজি মজা করে আমার নাম দিয়েছিলেন 'জুবিলি পারেখ'। সব পরিচালকদের বলতেন, 'আশাকে ছবিতে নাও, তাহলেই কিন্তু ছবি

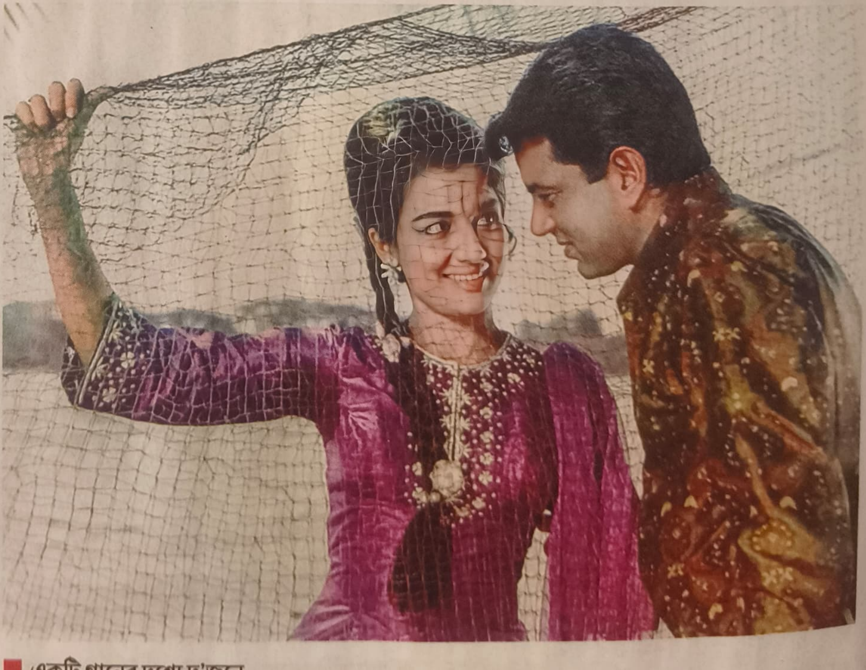
একবার মদ্যপান করে এসে আমার ভয়ে, ধরমজি একের পর এক কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে যাচ্ছিলেন! যাতে ওঁর মুখ থেকে আমি মদের গন্ধ না পাই।

সুপারহিট হবে!' আর একটা মজার ঘটনা শেয়ার করি। ধরমজির মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। অনেক সময় শুটিং সেটে হালকা মদ্যপান করে আসতেন। কিন্তু আমি তাতে খুব রেগে যেতাম। আমার বক্তব্য ছিল, শুটের পর যা ইচ্ছে হয় খেতে পারেন, কিন্তু শুটের আগে নয়। একবার মদ্যপান করে এসে আমার ভয়ে, শুটিং সেটে দেখি ধরমজি একের পর এক কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে যাচ্ছেন! যাতে ওঁর মুখ থেকে আমি মদের গন্ধ না পাই।

এসব তো গেল মজার ঘটনা। ধরমজিকে



ক্যামেরার সামনে ও বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের রসায়ন ছিল দুরন্ত

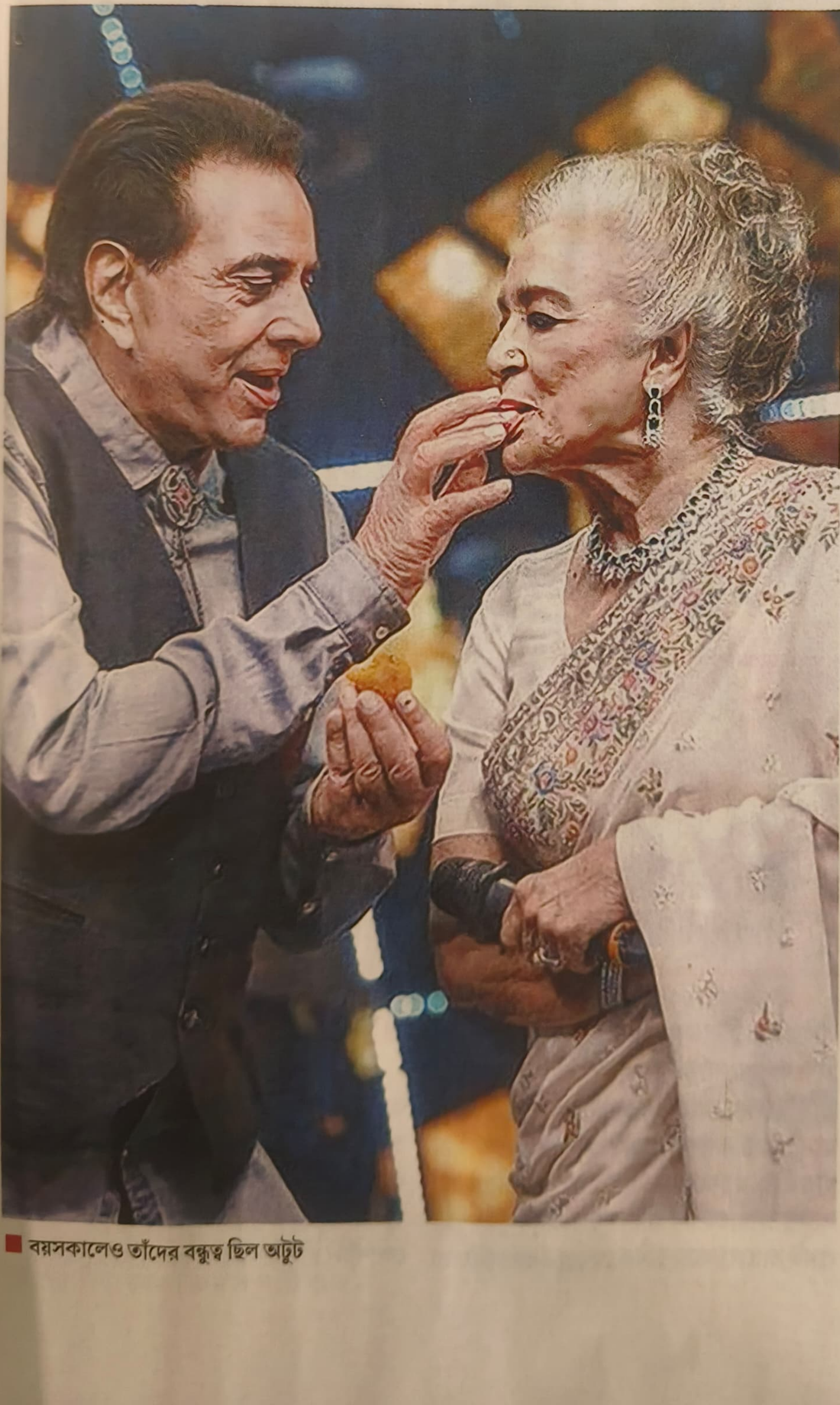


একটি গানের দৃশ্যে দু'জনে

অনেক ঝড়-ঝাপ্টাও সামলাতে হয়েছে। প্রকাশের পর হেমাজিকে বিয়ে করায় ওঁকে কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। মিডিয়া থেকে শুরু করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অনেক সহকর্মী, দিনের পর দিন ধরমজিকে নিয়ে নোংরা কথা বলে গিয়েছেন। আমার সঙ্গে ধরমজি সব কথাই শেয়ার করতেন। আমরা একসঙ্গে ছবির শুট না করলেও, আমাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। উনি দুঃখ করে বলতেন, হেমাজি এবং প্রকাশজি, দু'জনকেই উনি ভালবাসেন। উনি দু'জনের প্রতিই সমান যত্নশীল। তাহলে কেন ওঁকে নিয়ে এত খারাপ কথা বলা হয়? আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এমন অনেককে চিনি যাঁরা তলে-তলে একাধিক সম্পর্কে থাকতেন কিন্তু তা প্রকাশ্যে আসতে দিতেন না। বাইরে জনসমক্ষে তাঁদের চেয়ে ভদ্র আর কেউ নেই! ধরমজি তো তা করেননি। ভালবেসেছেন এবং সেই ভালবাসাকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি কখনও এটা ভাবেননি, যে এর ফলে তাঁর ইমেজের ক্ষতি হবে। আমি কাছ থেকে দেখেছি, ধরমজি সানি-ববিদের প্রতি যতটা কেয়ারিং ছিলেন, এষা-অহনাকে নিয়েও ততটাই প্রোটেক্টিভ ছিলেন। কাউকে কখনও অবহেলা করেননি। মানুষটা মাথা ঠান্ডা রেখে সবকিছু সামলেছেন। প্রথমদিকে ওঁর স্ত্রী প্রকাশ হয়তো হেমাজির সঙ্গে ধরমজির সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক বিষয়ই নরম্যালাইজ় হয়। আর সেটা ধরমজির জন্যই সম্ভব হয়। উনি বারবার এটা প্রকাশ এবং হেমাজিকে উপলব্ধি করান যে, দু'জনেই ওঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। দু'জনেই ওঁর মনের কাছের। তাই দেখুন, উনি কখনও হেমাজির সঙ্গে থাকতেন, কখনও প্রকাশজির সঙ্গে। সুন্দরভাবে ব্যালেন্স করে চলতেন। এটা ক'জন পারেন বলুন তো? তাও আবার বলিউডের নায়ক বলে কথা, যাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবসময় কাটাছেঁড়া চলছে! কিন্তু বাইরে থেকে ধরমজিকে দেখলে কখনও মনে হত না যে, উনি ভিতরে-ভিতরে এতটা মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন। হি ওয়জ় অলওয়েজ় ভেরি কুল। আমার সব সহ-নায়কই ক্রমশ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম

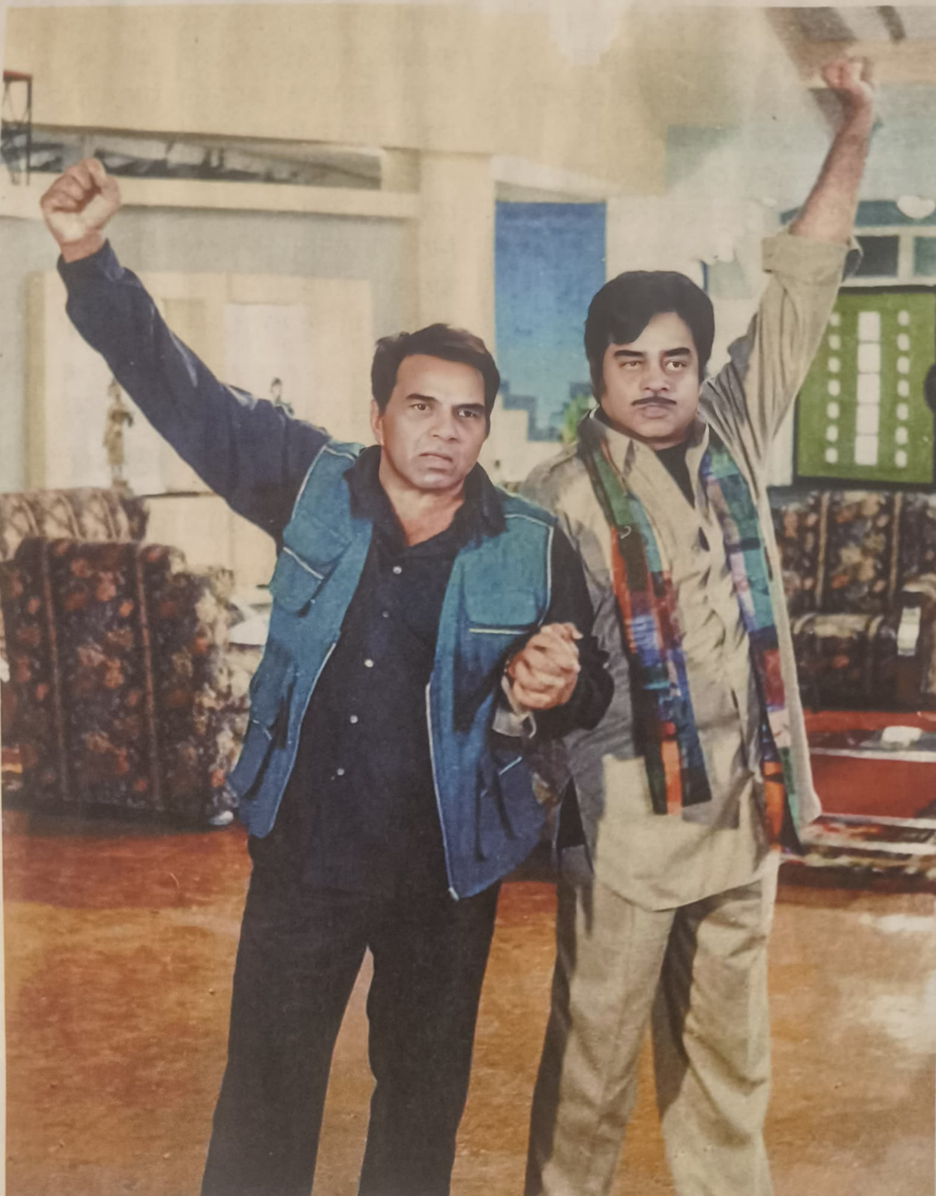
> প্রকাশের পর হেমাজিকে বিয়ে করায় ওঁকে কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। মিডিয়া থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রির অনেকে ধরমজিকে নিয়ে নোংরা কথা বলে গিয়েছেন। আমার সঙ্গে...



■ বয়সকালেও তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট



■ আশা-ধর্মেন্দ্রর জুটি ছিল সুপারহিট



আমার বড়ভাই

তাঁকে বড়ভাই হিসেবে মানতেন, কেরিয়ারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম পরামর্শ পেতেন। একসঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজও করেছেন। প্রিয় বড়দা **ধর্মেন্দ্র**র সঙ্গে নিজের গল্প শেয়ার করলেন **শত্রুঘ্ন সিনহা**

লেখার শুরুতেই একটা রহস্য ফাঁস করি। এটা প্রায় সকলেরই অজানা। রমেশ সিপ্পির কাল্ট ছবি 'শোলে'-তে প্রথমে ধরম পাজির সঙ্গে আমার অভিনয় করার কথা ছিল। সবকিছু প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর এবং সিপ্পিসাহেবের অন্য কিছুই পরিকল্পনা ছিল। যাই হোক, সেই প্রসঙ্গে বিশদে আর যাচ্ছি না। ধরমপাজি আমার বড় ভাই ছিলেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং আমার মনে হত উনি ঈশ্বরের পাঠানো দূত ছিলেন। যার জীবনে যেতেন তার জীবনে খুশি নিয়ে আসতেন। এরকম হৃদয়স্পর্শী মানুষ খুব কমই আসে। আর ছবির ক্ষেত্রে ধরমপাজি এত ভাল-ভাল ছবিতে অভিনয় করেছেন যে, তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। ধরমপাজির 'রাফতা রাফতা' গানটি দেখে আমি বরাবর মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ওই গানে ওঁর নাচ দেখে আমি ভাবতাম, এত অনায়াসে কীভাবে উনি ডান্স স্টেপসগুলো করছেন! আর আমি একেবারেই নাচতে পারি না। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওই গানে কীভাবে ওরকম নাচলেন? পাজি মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'আমি শুটের আগে যা করেছিলাম, তুমিও তাই করো। দেখবে নাচটা সহজে উঠিয়ে নিয়েছ। শুধু একটু মদ্যপান করে নিও শট দেওয়ার আগে!'

'পেয়ার হি পেয়ার', 'ব্ল্যাকমেল', 'জলজলা'... অনেক ছবিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। এমনকি ওঁর অনুরোধে আমি 'ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা ফির সে' ছবিতে একটি অতিথি চরিত্রও করি। এরকমই সহজ সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে।

ধর্মেন্দ্র নিজের জন্য যে সম্মান অর্জন করেছেন, তা খুব কম মানুষই পারেন। আমি যখন রাজনীতিতে এলাম, তখনও পাজি



■ একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে একসঙ্গে

আমাকে অনেকরকম উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু উনি নন, হেমার সঙ্গেও আমার খুব ভাল বন্ধুত্ব। আমরা তিনজন প্রচুর আড্ডা দিয়েছি, খাওয়াদাওয়া করেছি। আমার বাড়ির স্পেশ্যাল ছাতুর শরবত ধরমপাজির বিশেষ

পছন্দের ছিল। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে প্রতি শুক্রবার আনুগত্য বদলায়, সেখানে এতদিনের বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। দুলাল গুহের ছবি 'দোস্ত'-এর শুটিং করতে গিয়ে আমাদের ভারী মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেটে সেদিন ভেজ রান্না হয়েছে। আর পাজি সেই সময় নন-ভেজ ছাড়া খেতে পারতেন না। মাংস তো চাই-ই। সেটের লোকেরা কিছুতেই মাংস জোগাড় করতে পারেননি। শুট এমন একটি জায়গায় হচ্ছিল যেখানে আশেপাশে কোনও খাবারের দোকানও ছিল না। শুট শেষ করে রাত এগারোটা নাগাদ আমাকে গাড়িতে নিয়ে ধরমপাজি মাংস খুঁজতে বেরোন! প্রায় দেড়ঘণ্টা ড্রাইভের পর অবশেষে আমরা একটা ধাবা খুঁজে পাই। পাজি গুছিয়ে তন্দুরি চিকেন খেয়েছিলেন। খেতে ও খাওয়াতে খুবই



ধর্মেন্দ্র ও হেমা, দু'জনের সঙ্গেই শত্রুঘ্নর ভারী বন্ধুত্ব ছিল



রাখীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্র ও শত্রুঘ্ন

শুট শেষ করে রাত এগারোটা নাগাদ ধরমপাজি মাংস খুঁজতে বেরোন! প্রায় দেড়ঘণ্টা ড্রাইভের পর আমরা একটা ধাবা খুঁজে পাই। পাজি গুছিয়ে তন্দুরি চিকেন খেয়েছিলেন।



একটি শুটে সানি, ধর্মেন্দ্র, শত্রুঘ্ন ও ববি

ভালবাসতেন উনি। আমার স্ত্রী পুনমের সঙ্গেও পাজির খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। একসঙ্গে একটা ছবিও করেছেন। পুনমের সঙ্গে দেখা হলেই ওর হাতের রান্না খেতে চাইতেন। বলতেন, হেমা তো ভেজিটেরিয়ান, তাই নন ভেজ খাওয়ার জন্য উনি পুনমের কাছে আসবেন। বিহারি স্টাইলে মাটন ওঁর বিশেষ পছন্দের ছিল। ধরমপাজির সম্পর্কে আর একটা কথা না বললেই নয়। কোনওরকম অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। একবার আমরা একটা মিটিং সেরে গাড়ি করে ফিরছি। জুহুর কাছে একটি ট্র্যাফিক সিগনালে গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশে একজন মহিলার সঙ্গে এক ট্যাক্সি ড্রাইভার খুব অভব্য আচরণ করছিল। হঠাৎ করে ধরমপাজি গাড়ি থেকে নেমে যান এবং সোজা গিয়ে সেই ট্যাক্সিচালকের কলার চেপে ধরেন! এমনটাই ছিলেন উনি। নায়ক বলে যে একটা বিশেষ ইমেজ মেনটেন করবেন, এরকম কোনও খেয়ালই ছিল না ওঁর মনে। কোনওরকম নকল ব্যাপার ছিল না। একেবারে রক্তমাংসের মানুষের যেরকম হয়, সেরকমই ছিলেন আমার বড়ভাই ধরম পাজি। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম



■ মানুষের নেতা হতে চেয়েছিলেন, পেরেছিলেন কি?

রাজনীতিবিদ ধর্মেন্দ্র

সহজ সরল মানুষটি বুঝতে পারেননি, রাজনীতি তাঁর জন্য নয়। **ধর্মেন্দ্র**র সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন **অগ্নি রায়**। সেই অভিজ্ঞতার কথাই লিখলেন তিনি

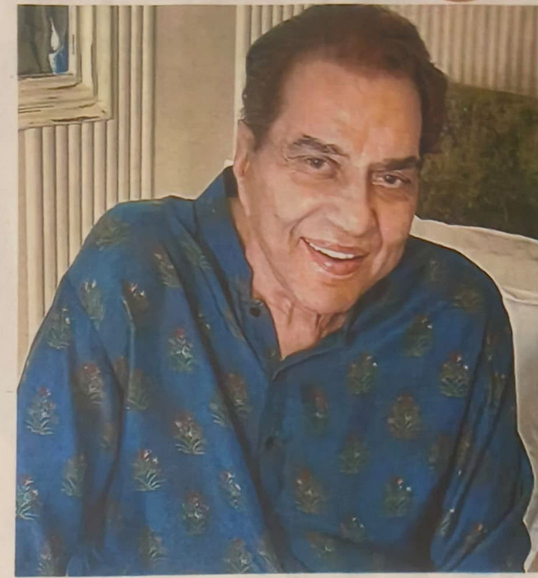
প্রথম দিকে প্রতি সংসদীয় অধিবেশনে পাঁচ সাত দিন করে হাজির থাকলেও, রাজধানীতে ক্রমশ কমে আসছিল ধর্মেন্দ্রের উপস্থিতি। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে বিকানেরের এই বিজেপি সাংসদ ক্রমশই হয়ে উঠছিলেন রাজনীতির প্রতি বিরক্ত। একেবারে শেষ দিকে নিয়মরক্ষার্থে এক বা দু'দিন আসতেন। ধীরে ধীরে উঠতেন সংসদের সিঁড়ি দিয়ে। তাঁর পায়ের সমস্যা তখনই শুরু হয়ে গিয়েছে। চলতে সামান্য অসুবিধা হত, হাত ধরে থাকতেন হেমা মালিনী। সবসময়ই শাদা শার্ট, দুটো বুক পকেটওয়ালা। এর বাইরে কোনও পোশাকে তাঁকে সংসদে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। যেভাবে রেখাও আসতেন ঘিয়ে এক রংয়ের তসরের শাড়ি পরে। বিষয়টিকে তাঁরা সংসদের ইউনিফর্মই বানিয়ে নিয়েছিলেন।

তবে তার মাঝেই করিডরে ধর্মেন্দ্রকে পেলেই দাঁড়ি করিয়ে দিতাম আমরা, অর্থাৎ সাংবাদিককুল। পুরনো দিনের সিনেমার কথা তুললে, অপূর্ব সেই হাসিটা হাসতেন, বয়স যা কখনওই কেড়ে নিতে পারেনি। সুচিত্রা সেন যে তার প্রিয় নায়িকা ছিলেন, তা গোপন রাখতেন না, বিশেষ করে বাঙালি সাংবাদিকের পরিচয় পেলে। দেখা হলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কলকাতা এবং সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গ আসত। একবার বললেন, "কলকাতায় আমার অনেক ফ্যান জানো তো? এয়ারপোর্টে নামলেই গুরু, গুরু বলে চিৎকার করে সবাই! কলকাতায় তো অনেক শুটিং করেছি। আর হৃষীদা, মানে তোমাদের হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমার গুরুস্থানীয়।" হৃষীকেশের নাম করলেই কপালে হাত ঠেকাতেন

ধর্মেন্দ্র, বোঝা যেত ওই বাঙালি পরিচালকের জন্য কতটা শ্রদ্ধা জমিয়ে রেখেছেন তিনি, এতগুলো দশক পার হয়ে যাওয়ার পরও।
তবে তিনি সিনেমাতেই ছিলেন স্বচ্ছন্দ, রাজনীতিতে একেবারেই নয়। শর্মিলা ঠাকুর একবার বলেছিলেন, ‘ওঁর আশপাশের লোক ওঁকে নিশ্চয়ই বুঝিয়েছিল রাজনীতিতে যোগ দিতে। কিন্তু রাজনীতি তাঁর মতো সহজ সরল মানুষের ‘কাপ অফ টি’ ছিল না, তা বোধহয় নিজেই খুব তাড়াতাড়ি অনুভব করেছিলেন। যে লোকসভা ভোটে ধর্মেন্দ্র জেতেন, সেই ২০০৪ সালেই বাজপেয়ী সরকারের পতন ঘটে। বিজেপি-তেও শুরু হয় নতুন যুগ। হয়তো বাজপেয়ীর ক্যারিশমা ধর্মেন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল রাজনীতিতে আসতে। কিন্তু সেই নির্বাচনে বাজপেয়ী এবং ধর্মেন্দ্র নিজের-নিজের সিটে জিতলেও, পার্টি হিসেবে বিজেপি হেরে যাওয়ার পর যে গোষ্ঠী রাজনীতি শুরু হয় দলে, তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি ধর্মেন্দ্র। তাই মোহভঙ্গ এবং হতাশায় শেষ হয়েছিল তাঁর স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক জীবন।

জনপ্রিয়তা ও রাজনীতির পঙ্কিল জগৎ

আসলে ক্যামেরা এবং পরিচালকের নির্দেশ ছাড়া জীবনের আর কোনও ক্ষেত্রেই সমঝোতা করার মানুষ ছিলেন না ধর্মেন্দ্র। সাতের দশকে তখন মুম্বইয়ে মাফিয়াদের বিরাট দাপট চলছে। হাজি মস্তান, করিম লালাদের মতো গ্যাংস্টারদের নামেই কেঁপে উঠত মায়ানগরী। ঠিক সেই সময়ে এই গ্যাংয়ের লোকজনের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ধর্মেন্দ্র বলে দিয়েছিলেন, ‘আমাকে ভয় দেখিয়ো না। তোমরা দশজন লোক পাঠালে, আমার জন্য পাঞ্জাব থেকে ট্রাকভর্তি লোক আসবে।’
২০০৪ সালে বিজেপির ‘শাইনিং ইন্ডিয়া’ ক্যাম্পেনে যোগ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে আসেন ধর্মেন্দ্র। রাজস্থানের বিকানের থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে লোকসভা নির্বাচনে জেতেন তিনি। তবে সে সময়ই তাঁর এক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক। রাজস্থানে প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, ‘গণতন্ত্রের মৌলিক শিষ্টাচার শেখাতে আমাকে একনায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা উচিত।’ এই মন্তব্যেই সরব হয় বিরোধী শিবির। প্রশ্ন ওঠে, ধর্মেন্দ্র কি একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী? তবুও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী রামেশ্বর লালকে ৬০ হাজার ভোটে হারিয়ে তিনি সাংসদ হন। পরে লোকসভায় নিয়মিত উপস্থিত না থাকা নিয়ে শুরু হয় সমালোচনা। বিকানেরের মানুষ অভিযোগ করেন, তিনি শুটিং আর ফার্মহাউজ়ের জীবনেই ব্যস্ত, এলাকার সমস্যার খোঁজ নেওয়ারও সময় পান না। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই ধর্মেন্দ্র ঘোষণা করেন, তিনি আর ভোটে লড়বেন না। পরে সানি দেওল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বাবা রাজনীতি পছন্দ করতেন না। পরে তিনি অনুশোচনাও করতেন যে কেন রাজনীতিতে এসেছিলেন।’ নিজেও এক সাক্ষাৎকারে ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন, ‘কাজ আমি করব, আর কৃতিত্ব নেবে অন্য কেউ।’ তিনি পরে স্বীকার করে নেন, রাজনীতিতে তাঁর আসা ঠিক হয়নি। এই



কলকাতার কথা শুনলে খুব খুশি হতেন

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই ধর্মেন্দ্র ঘোষণা করেন, তিনি আর ভোটে লড়বেন না। পরে সানি দেওল এক সাক্ষাৎকারে বলেন...



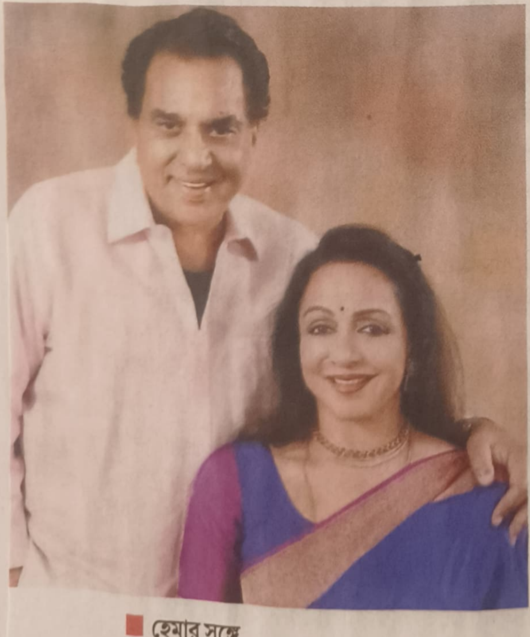
স্ত্রী হেমার সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে। যদিও চাননি হেমা রাজনীতিতে আসুন

জায়গাটা তাঁর জন্য নয়। তিনি এও স্বীকার করেন, রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পরেই তাঁর দর্শকদের মধ্যে একটা বিভাজন দেখা দেয়। তাঁর জনপ্রিয়তায় একটা প্রভাবও পড়ে। পরবর্তীকালে স্ত্রী হেমা মালিনীও রাজনীতিতে আসেন, বিজেপির সাংসদ হন। তবে স্ত্রী রাজনীতির ময়দানে আসুন, তাতেও নাকি মত ছিল না ধর্মেন্দ্রের।

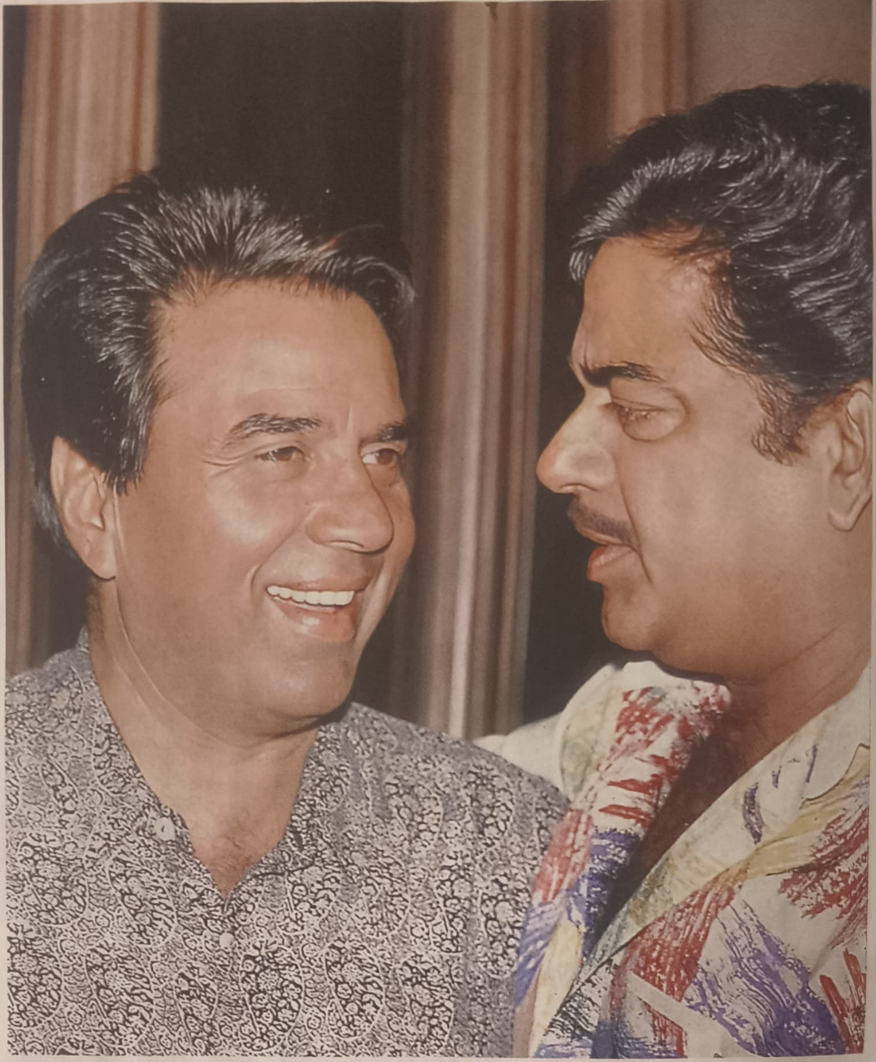
বিকানেরের সাংসদ, ভুল সময়ে

আজ থেকে ঠিক একুশ বছর আগে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর জিপে সওয়ার হয়ে ভোট প্রচার কভার করার স্মৃতি আমার আজও অমলিন হয়ে আছে। রাজস্থানের বিকানেরে সেদিন রোদের তাপে ফোস্কা পড়ার দশা। ধু-ধু মরুভূমি, আকাশে ঘুড়ি ওড়ে শুধু, অথচ মানুষ দেখা যায় না! এক সপ্তাহে উদয়পুর, যোধপুর সেরে বিকানের পৌঁছেছি ধর্মেন্দ্রর নির্বাচনী ক্ষেত্রে। বিজেপি-র পার্টি অফিসে হত্যে দিয়ে থেকে একজনকে পাওয়া গেল, যিনি ধর্মেন্দ্রর প্রচার কমিটির সদস্য। জানালেন, 'পা

একজনকে পাওয়া গেল, যিনি ধর্মেন্দ্রর প্রচার কমিটির সদস্য। জানালেন, 'পা জী'-র যদি মুড ভাল থাকে তাহলে বরাত খুলবে।



হেমার সঙ্গে



ধর্মেন্দ্র ও শত্রুঘ্ন: দু'জনেই এসেছেন রাজনীতিতে

জী'-র যদি মুড ভাল থাকে তাহলে বরাত খুলবে। ওঁর সঙ্গে ঘোরা যাবে। লালগড় প্যালেস হোটেলে তাঁর ডেরা। বিকেলে প্রচারে বেরোচ্ছেন। আমি হাজির দুপুরেই। বসে আছি বিশাল একটা সুইটে, সামনের একটি বন্ধ দরজা। খুললেই ধর্মেন্দ্র বেরোবেন, এমনটাই আশা। বেরোলেন ঘণ্টা-তিনেক পর। হ্যাংওভার-ক্লান্ত অতি গম্ভীর মুখ, অনভ্যস্ত প্রচারের ধকল সামলাতে পানাহার একটু বেশিই হচ্ছে রাতে! স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম। তাঁর জিপে প্রচারে ঘুরতে চাই, বলার সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমার কাগজ কলকাতার।

মুহূর্তে উদ্ভাসিত তখনই সত্তর ছুঁইছুঁই ধর্মেন্দ্রর মুখে সেই হাসি দেখা গেল, যা দেখে উতরোল গোটা দেশের মীনা কুমারীরা! প্রথম বাক্য বলেছিলেন, 'হাউ ইজ় সুচিত্রা সেন? দ্য সুইট লেডি! ক্যায়সি হ্যায় উয়ো? সব খয়রিয়ৎ?' জানা ছিল, ওঁদের একসঙ্গে করা ছবির নাম 'মমতা'। আর কিছু না ভেবে আমি এমনভাবে ওঁকে খবর দিলাম, যেন মিসেস সেনের সঙ্গে তিনদিন আগেই কলকাতায় দেখা করে, এই বিকানেরে নির্বাচন কভার করতে এসেছি! কারণ আমি তখন মরিয়া। এতটা যখন এসেছি, ওঁর কাছ থেকে 'না' শোনা যাবে না। বলেই বুঝলাম, বরাত খুলেছে! প্রসন্ন থেকে প্রসন্নতর হলেন। পাশের সহায়ককে বললেন, 'ইয়ে বাচ্চাকো গাড়ি মে বৈঠা লে না।'

সেই দিনের স্মৃতি

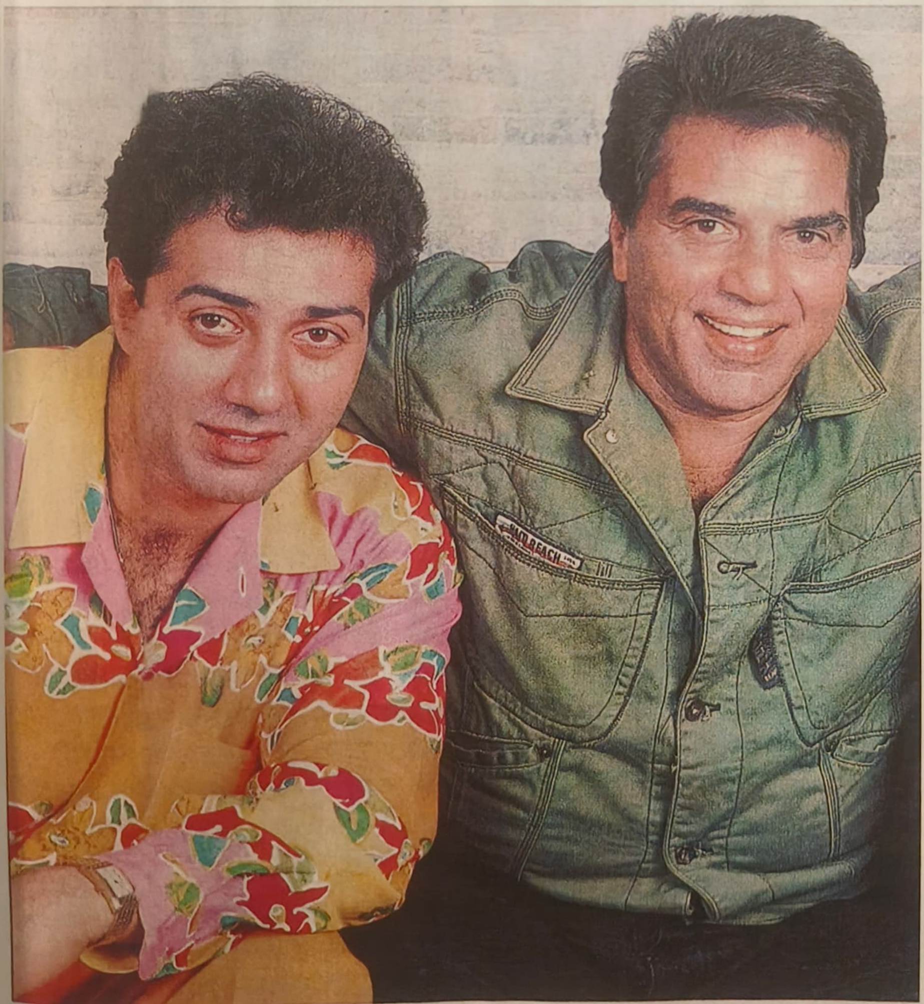
ঘটনাচক্রে রিপোর্টার বলতে সেই বিকেলে আর কেউ ছিল না। ফলে ওঁর জিপে আমি একাই সাংবাদিক, বাকি পারিষদ, দলীয় কর্মী, আমচা-চামচা। জিপ চলছে। শাদা তোয়ালে, ঠান্ডা জলের বোতল নিয়ে ড্রাইভারের পাশে ধর্মেন্দ্র। পিছনের সিটে

ঘাপটি মেরে বসে আছি। সুযোগ সুবিধা মতো টুকটাক কথা বলছি। বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, মাঝে আলপনা দেওয়া অপূর্ব সব বাড়ি। ভাঙাচোরা মুখগুলো বেরিয়ে আসছে পরম কৌতূহলে। একটু ভিড় জমলে, জিপ থামছে। ধর্মেন্দ্র লাফিয়ে নেমে, উনিশ-বিশ একই ডায়ালগ দিচ্ছেন। 'আজ আপনাদের গ্রামে 'বীরু' এসেছে। আপনাদের জলের সমস্যা, খরার কষ্ট, সরকারি যোজনা না পাওয়ার বেদনা আর থাকবে না। এখানে জল ধরার ব্যবস্থা হবে, বড় বড় ট্যাঙ্ক বসবে। না সুসাইড করার জন্য নয়! পানীয় জলের জন্য। আপনারা আমায় জিতিয়ে আনুন।' রাজস্থানী গয়না গয়নায় ঠোকাঠুকি, কৌতূহল, চাপা

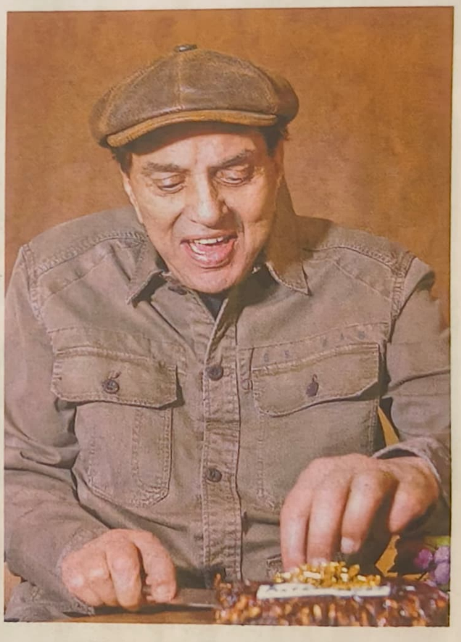


বিকানেরে প্রচারকার্যের সময়

ভারতটা যে রমেশ সিপ্পির সেট নয়, এবং রাজনীতিটাও তাঁর কম্মো নয়, তা তখনও জানতেন না ঠোঁটকাটা, জ়িন্দা দিল, প্যাঁচহীন ওই নায়ক। ফলে ফেঁসে গেলেন ওই পঙ্কিল জগতে



ছেলে সানি দেওলও চাননি বাবা রাজনীতিতে আসুন



জীবনটা বেঁচেছেন নিজের ছন্দে। শুধু রাজনীতিতে এসে ভুল করলেন।

হাসাহাসি, ভিড়। অনেকেই ফুল দিলেন তাঁদের প্রিয় বীরুকে। জানালেন, জলের ভয়াবহ সংকটের কথা। ভারতটা যে রমেশ সিপ্পির সেট নয়, এবং রাজনীতিটাও তাঁর কম্মো নয়, তা তখনও জানতেন না ঠোঁটকাটা, জ়িন্দা দিল, প্যাঁচহীন ওই নায়ক।

প্রচার শেষ হওয়ার পর পেল্লায় হ্যান্ডশেক করলেন। আমার গোটা শরীরটাই নড়ে উঠল যেন! 'মিলতে রঁহনা খুশ রহনা' বলে উধাও হয়ে গেলেন ওই বিশাল প্যালেসে। কিন্তু ততক্ষণে আমার নোটবুকে লেখা হয়ে গিয়েছে জাদু বাস্তবের মতো এক 'স্টোরি', যার স্মৃতি আজও অমলিন।



মীনার ভালবাসা, ধর্মেন্দ্রর শ্রদ্ধা

ধর্মেন্দ্র নাকি মীনাকুমারীকে কেবল 'শ্রদ্ধা' করতেন। কিন্তু মীনা চেয়েছিলেন তাঁর ভালবাসা। বিনিময়ে পেলেন প্রতারণা? বিনোদন জগতে **ধর্মেন্দ্র**র প্রথম 'প্রেম' নিয়ে লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

ট্র্যাজেডি কুইন মীনাকুমারী যখন মারা যান, তখন তাঁর সবচেয়ে কাছের বান্ধবী নর্গিসের লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয় এক উর্দু পত্রিকায়। চিঠির শীর্ষক ছিল, 'মওত মুবারক হো মীনা'। সেই চিঠিতে উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। মীনাকুমারী ও ধর্মেন্দ্রর প্রেমের কথা। মীনা নাকি ধর্মেন্দ্রর প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রেম পরিণতি না-পাওয়ায় হাতে তুলে নিয়েছিলেন মদের বোতল। নর্গিসের সেই চিঠিতে স্পষ্ট বলা ছিল, ধর্মেন্দ্রর কাছ থেকে প্রতারিত হওয়ার পরই মীনা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর সিরোসিস অফ লিভার হয়। ধর্মেন্দ্র এবং মীনাকুমারীর 'প্রেম' নিয়ে (ধর্মেন্দ্রর থেকে দু'বছরের বড় ছিলেন মীনা) অনেক কথা শোনা যায়। মীনার সঙ্গে স্বামী কমাল অমরোহীর সম্পর্ক যখন প্রায় শেষ, তখন মীনার জীবনে আসেন ধর্মেন্দ্র। বলা যেতে পারে, মীনাই ধর্মেন্দ্রকে নিজের জীবনে টেনে আনেন। সালটা ১৯৬৪। সুপারস্টার মীনা তখন নতুন নায়কদের ভাগ্য গড়ে দিতেন। এমনটা হয় ধর্মেন্দ্রর ক্ষেত্রেও। মীনার নেকনজরে থাকার ফলে নায়িকা ধর্মেন্দ্রর হয়ে অনেক জায়গায় সুপারিশ পেশ করেছিলেন।

ধর্মেন্দ্র পঞ্জাব থেকে আসা সুদর্শন যুবক, কোনও ছবিতেই সেভাবে ছাপ রাখতে পারেননি, 'শোলা অউর শবনম' (১৯৬১)-এ হয়তো কেউ-কেউ লক্ষ করেছিলেন ছেলেটিকে। 'পূর্ণিমা' (১৯৬৫) ছবিতে মীনাকুমারীর বিপরীতে অভিনয় করতে হবে শুনে তো ধর্মেন্দ্র প্রায় অজ্ঞান! মীনাকুমারী তখন সুপারস্টার! তাঁর সামনে শট দেবেন কী করে? সকলে বলেছিল, সেটে গিয়ে প্রণাম করতে মীনাকে। সেটে যখন গেলেন, সত্যিই মীনাকে বললেন কতটা শ্রদ্ধা করেন তাঁকে। পা ছুঁয়েছিলেন কি না জানা নেই, তবে মীনার মন ছুঁয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। মীনা সকলের সামনেই বলেছিলেন, 'এ রোজকার নিউ কামার নয়। এই ছেলে অনেক দূর যাবে।' সেটে মীনা যেভাবে ধর্মেন্দ্রকে আপন করে নিয়েছিলেন, পদে-পদে গাইড করছিলেন, ভুল শুধরে দিচ্ছিলেন, ধর্মেন্দ্র তাতে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। মীনা নাকি আশেপাশে এমন গুণমুগ্ধ ভক্ত নিয়ে চলতে ভালবাসতেন। বয়স কম, সুদর্শন, অনুগত...আসলে পুরুষতান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও নায়কের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া, তাঁকে পথ দেখানোর মধ্যে একটা আত্মগরিমার ব্যাপারও আছে বই কী। সকলেই দেখছিল, কীভাবে নিজের শট শেষ হয়ে যাওয়ার পর, মীনা স্টুডিয়োয় উপস্থিত থেকে ধর্মেন্দ্রর সিনগুলো অভিনয় করে দেখাতেন, কীভাবে সাবলীল অভিনয় করা যায়। ধর্মেন্দ্রর ক্যামেরার আড়ষ্টতা কাটিয়েছিলেন মীনাই। সেভাবে দেখতে গেলে মীনা যেরকম বিদ্বান, পড়াশোনা করা, লিখিয়ে পুরুষদের পছন্দ করতেন, সেরকম একেবারেই ছিলেন না ধর্মেন্দ্র। বরং উল্টোটাই ছিলেন। তাঁর মধ্যে পঞ্জাবের মাটির গন্ধ ছিল। একটা কাঁচা, গ্রাম্য গন্ধ। বোধহয় সেটাই ভাল লেগে গিয়েছিল মীনার। স্বামী কমালের বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর একটা শক্ত কাঁধ খুঁজছিলেন মাথা রাখার জন্য। আর ধর্মেন্দ্রও খুঁজছিলেন এমন কাউকে, যাঁর সহায়তার কেরিয়াররের তরী পার করতে পারবেন। তার জন্য প্রেমের ছলনা করতে হলে, তা-ই সই।

কামালের সংসার ছেড়ে আসার পর মীনা ছিলেন ভগ্নিপতি মেহমুদের বাড়িতে। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর নিজের একটা পরিসর খুঁজছিলেন তিনি। পাঁচ

মাসের মাথায় জুহুতে 'জানকী কুটীর' নামের একটি সুন্দর বাংলোয় উঠে যান মীনা। জানকী কুটীরের নিয়মিত 'অতিথি' ছিলেন ধর্মেন্দ্র। মীনা এবং ধরম নাকি দিনের শেষে বেশ পানের আসর বসাতেন। সুরার প্রতি প্রেম দু'জনেরই সমান ছিল। তবে মীনার সুরাসক্তি বাড়াননি ধরম। বরং তিনি থাকলে মীনা অনেক নিয়ন্ত্রণে থাকতেন। ধরম বারবার বলতেন, মীনার প্রতি তিনি কত কৃতজ্ঞ। ততদিনে 'কাজল' ছবিটিও হয়ে গিয়েছে। খুব একটা না চললেও ধরম-মীনার জুটি নজর কেড়েছিল। মীনার সঙ্গে থাকার জন্য একটা গুজব তো হয়েইছিল। ধরম তখন বিবাহিত, এক ছেলে (সানি) ও মেয়ের (বিজেতা) বাবাও। কিন্তু এমন গুজবে খবরে থাকা যায়। তাই চেষ্টাও করেননি সেই গুজবের কুয়াশা দূর করার। মীনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন তিনি। কিন্তু মীনা তো শ্রদ্ধা চাননি! চেয়েছিলেন ভালবাসা।
ধর্মেন্দ্রর জীবনীকার রাজীব বিজয়কর তাঁর 'ধর্মেন্দ্র: আ বায়োগ্রাফি। নট জাস্ট আ হি-ম্যান' বইতে মীনাকুমারী সম্পর্কে



'ফুল অউর পত্থর'-এর প্রিমিয়ারে হাতে হাতে ধরে মীনা ও তাঁর ধরম



'পূর্ণিমা' ছবির দৃশ্যে মীনাকুমারী ও ধর্মেন্দ্র

লিখেছেন, "...the first unfortunate involvement that happened in Dharmendra's life." ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে মীনার প্রেম খুব গভীর হলেও মীনার নাতিদীর্ঘ জীবনের মতোই তার দৈর্ঘ্য ছিল ছোট। 'কাজল' ছবিটিতে মীনা এবং ধর্মেন্দ্রর জুটি নজর কাড়ার পর 'ফুল অউর পত্থর' (১৯৬৬) তাঁদের স্বীকৃতি দিল। তাঁদের জুটির প্রথম সুপারহিট ছবি। মীনার অসাধারণ অভিনয়,

> জানকী কুটীরের নিয়মিত অতিথি ছিলেন ধর্মেন্দ্র। মীনা এবং ধরম নাকি দিনের শেষে বেশ পানের আসর বসাতেন। সুরার প্রতি প্রেম দু'জনেরই সমান ছিল। তবে মীনার সুরাসক্তি...

ধর্মেন্দ্রর পরিশ্রম, গান, সংলাপ... সবমিলিয়ে এক জমজমাট ছবি, যা ধর্মেন্দ্রের কেরিয়ারকে একটা শক্ত ঠাঁই দিয়েছিল। মীনা সর্বত্র তখন ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে যান, ইচ্ছে করেই কখনও হাত ধরে ফেলেন, আর সেই ঘটনা পরেরদিন খবরের কাগজের শোভাবর্ধন করে। ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে একটা চিরস্থায়ী সম্পর্কের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন মীনা। তিনি আসলে যখন যাকে ভালবেসেছেন, বাঁধ মানেনি সেই ভালবাসা। একবার কোনও এক পিকনিকে পৌঁছে ধর্মেন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল মীনা পাগলের মতো 'আমার ধরম কোথায়?' বলে চেঁচাতে থাকেন। আবার ধর্মেন্দ্র ছবির প্রিমিয়ারে দিল্লি থেকে ফেরার ফ্লাইট ধরতে না পেরে কাকুতি-মিনতি করেন, 'আমাকে বম্বে যেতেই হবে। মীনা অপেক্ষা করছে!' অর্থাৎ উন্মাদনা দু'তরফ থেকেই ছিল। যদিও ধর্মেন্দ্র একে 'শ্রদ্ধা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন বরাবর। ধর্মেন্দ্রকে নাকি 'পাকিজ়া' ছবির নায়ক হিসেবে বেছেছিলেন কমাল অমরোহী। কিন্তু মীনার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর প্রেমের খবর সামনে আসতে সেই চরিত্র থেকে ধর্মেন্দ্রকেই বাদ দিয়ে দেন কমাল। ধর্মেন্দ্র যতই সম্পর্কের কথা অস্বীকার করুন না কেন, তাঁর নিত্যদিন মীনার বাড়িতে যাওয়া, পানাহারের আসর বসানোর খবর কমাল পেয়ে যেতেন। কারণ মীনার বোন মধুও ততদিনে স্বামী মেহমুদের বাড়ি ছেড়ে জানকী কুটীরের বাসিন্দা।
ধর্মেন্দ্র আসলে সংসার ভেঙে কোনওভাবেই মীনার সঙ্গে সংসার করতে চাননি (অথচ এই ধর্মেন্দ্র পরবর্তীকালে হেমা মালিনীর জন্য আগের সংসারের ধার ধারেননি)। মীনাও অবশ্য তখন আইনত কমাল আমরোহীর বেগম। ফলে এই সম্পর্কের পরিণতিও একটি ট্র্যাজেডি হয়েই থেকে গিয়েছিল।

তথ্য সহায়তা: মীনা কুমারী: দ্য ক্লাসিক বায়োগ্রাফি (বিনোদ মেহতা, ১৯৭২); ধর্মেন্দ্র: আ বায়োগ্রাফি: নট জাস্ট আ হি-ম্যান (রাজীব এম বিজয়কর, ২০১৮)



হেমা মালিনী ও ধর্মেন্দ্র

প্রেমের ধরম

প্রেমে সিদ্ধি পাওয়ার জন্য সমাজ ও ধর্মের যাবতীয় মিথ ভেঙেছেন ধর্মেন্দ্র। বিতর্কিত হয়েছেন। কিন্তু শেষে চরিতার্থ করেছেন নিজের অহং এবং স্বার্থ। লিখেছেন সায়ক বসু

সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়। একটি জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকায় হেমা মালিনী এবং ধর্মেন্দ্র একসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার দেন। তখন তাঁদের প্রেমপর্ব সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবেননি। সেই সাক্ষাৎকারে হেমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ধর্মেন্দ্র-পত্নী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী রকম। হেমা বলেন, খুবই ভাল সম্পর্ক। প্রকাশ নাকি তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করেন, নিয়মিত ফোন করেন। কিন্তু হেমা ভীষণ ব্যস্ত। তাই প্রকাশের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। বরং



কি সত্যিই ধর্মেন্দ্রর প্রথম প্রেম ছিলেন? বা বিয়ে করে খুশি ছিলেন তাঁরা? বোধ হয় না। অন্তত প্রাথমিকভাবে তো নয়ই। ধর্মেন্দ্র খুব অল্প বয়সে প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর ১৯ বছর বয়স। প্রকাশের ১৭ বছর। মূলত বাবার জোরাজুরিতে বিয়ে করতে বাধ্য হন ধর্মেন্দ্র। তখন তিনি একটি ছোট চাকরি করতেন। কিন্তু এই বিয়ে তাঁর মনে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ প্রকাশ ধর্মেন্দ্রর প্রথম ভালবাসা ছিলেন না! অভিনেতা মন দিয়েছিলেন অন্য একজনকে। দেশভাগ ধর্মেন্দ্রর প্রথম সেই প্রেম ছিনিয়ে নেয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মেন্দ্র লুধিয়ানার নাসরালি নামে যে

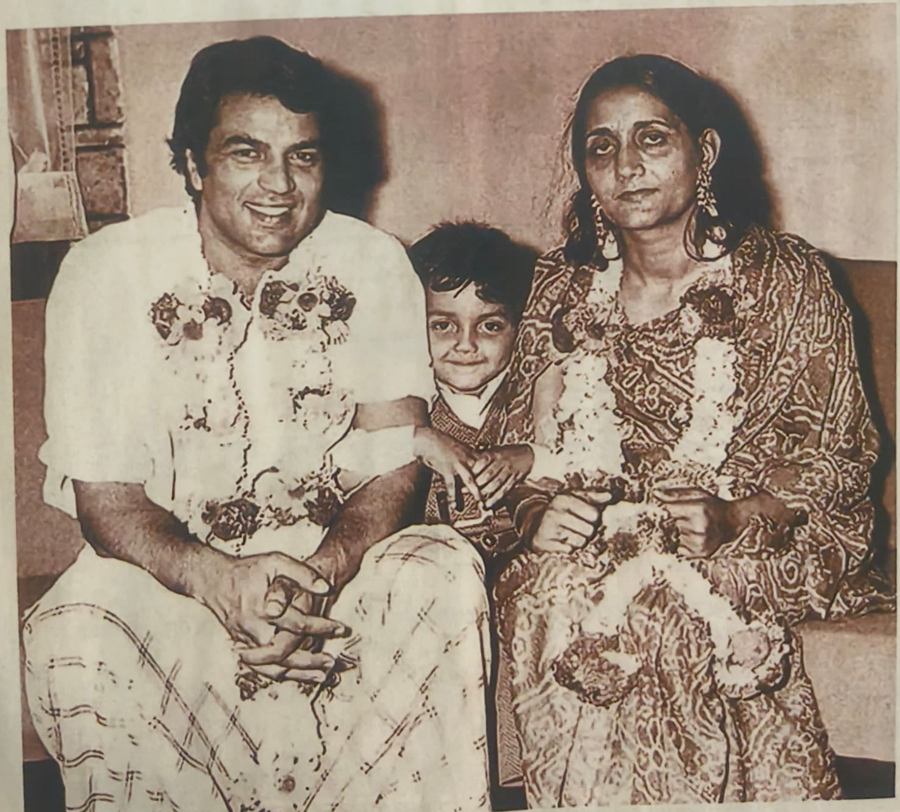
প্রকাশ ধর্মেন্দ্রর প্রথম ভালবাসা ছিলেন না! অভিনেতা মন দিয়েছিলেন অন্যকে। দেশভাগ ধর্মেন্দ্রর প্রথম সেই প্রেম ছিনিয়ে নেয়। ১৯৪৭ সালে...

■ একে অপরের প্রেমে অন্ধ হয়েছিলেন তাঁরা

সিনেমার শুটিংয়ের দৌলতে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে বেশি সময় কাটান। স্ববিরোধী বক্তব্য। বোঝাই গিয়েছিল, হেমা বিষয়টিকে এড়ানোর জন্য এরকম ঘোরানো-প্যাঁচানো উত্তর দিচ্ছেন। কারণ তখন তাঁর ধর্মেন্দ্রকে চাই। বিতর্ক এড়িয়ে, যেভাবে হোক। আর ধর্মেন্দ্রও তখন হেমার প্রেমে পাগল। তাই নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এরকম কথা শুনেও চুপ করে ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন? প্রকাশ কি তার আদত ভালবাসা ছিলেন না? এই প্রতিবেদনের শিরোনাম দেখে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। ধর্মেন্দ্রর প্রেম জীবন সত্যি সত্যিই যে-কোনও জটিল মনস্তত্ত্বের গল্পের প্রতীকী উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ এত বহুস্তরীয়, এত বহুমুখী এবং বহুগামী সম্পর্ক সেই সময় খুব বেশি নায়কের ছিল বলে মনে হয় না।

প্রথম প্রেম অন্য কেউ?

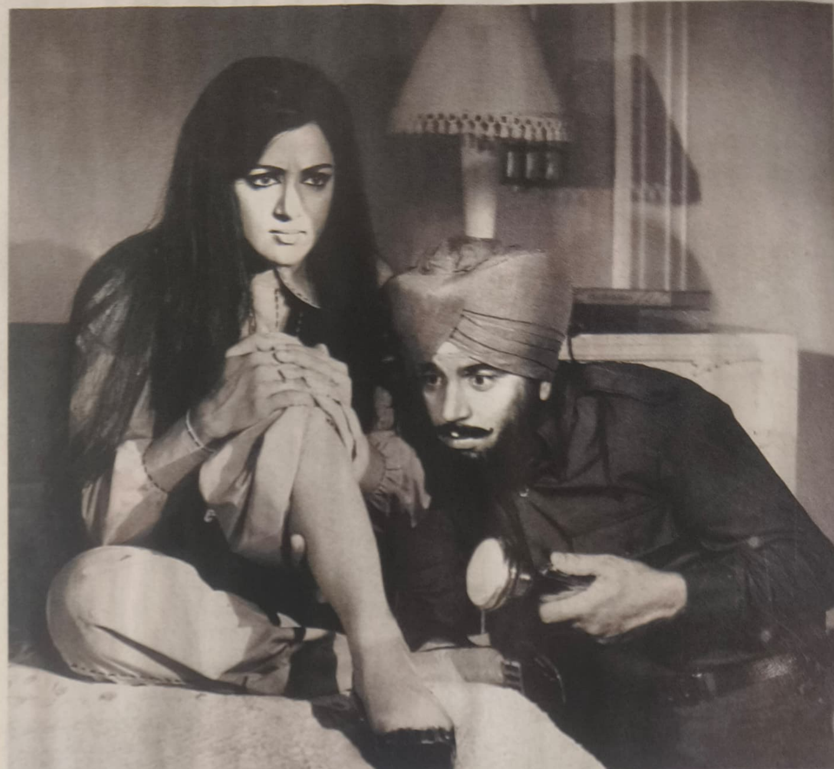
এই সাক্ষাৎকারের গল্পে আমরা পরে আসব। তার আগে সেই প্রশ্নটায় আসা যাক, প্রকাশ



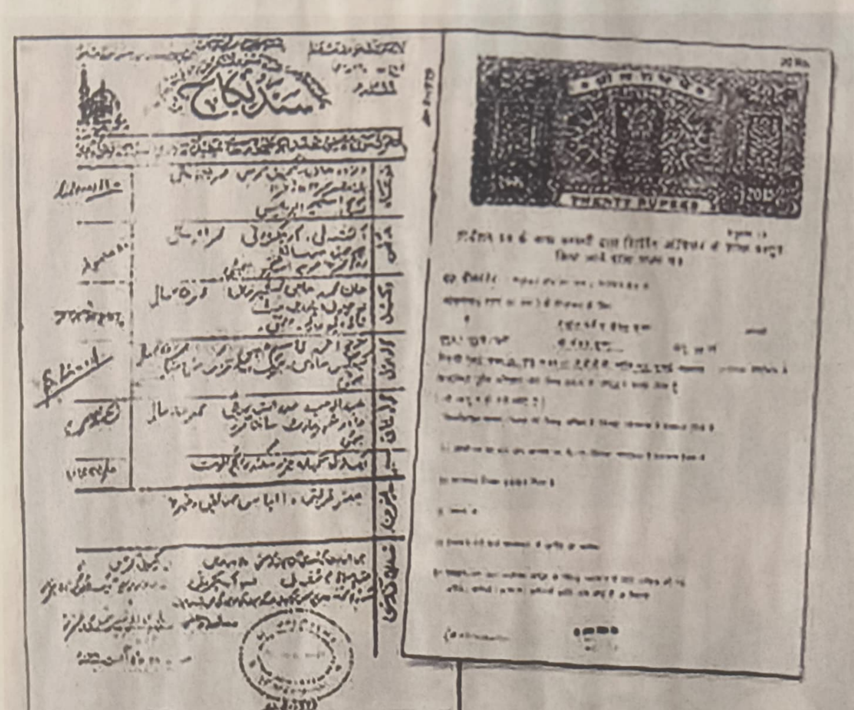
■ প্রকাশকেই স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। মাঝে তাঁদের পুত্র ববি দেওল

গ্রামে থাকতেন, সেই গ্রামেই থাকতেন হামিদা বলে একটি মেয়ে। হামিদা ধর্মেন্দ্রর থেকে বয়সে একটু বড় ছিলেন, তবে সেই সময়ে সেটা ভাবনার বিষয় ছিল না ধর্মেন্দ্রর কাছে। সেই সময়ে ধর্মেন্দ্র ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তেন আর হামিদা পড়তেন অষ্টম শ্রেণিতে। হামিদা ছিলেন নায়কের শিক্ষকের মেয়ে। তখন থেকে ধরম খালি চাইতেন, হামিদার পাশে বসতে। দূর থেকে হামিদাকে দেখতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। সেই সময়ে ধর্মেন্দ্র ভীষণ লাজুক ছিলেন বলে কখনও মুখে বলেননি তাঁর ভাল লাগার কথা। ছোটবেলার প্রেম, মনের কথা মনেই রেখেছিলেন তিনি। হামিদা কখনও জানতেই পারেননি যে ধর্মেন্দ্রর তাঁকে ভাল লাগে। পরবর্তী কালে ধর্মেন্দ্র একটি কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি হামিদার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালে হামিদা তাঁর পরিবারের সঙ্গে পাকিস্তান চলে যান এবং ধর্মেন্দ্র ভারতে থেকে যান। তাঁদের আর কখনও দেখা হয়নি। ফলে সেই ভালবাসা ভুলতে পারেননি ধরম। পরে অবশ্য সেই প্রকাশের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর সম্পর্ক স্বাভাবিক



■ হেমার সঙ্গে ছবি করলে প্রযোজকদের তাঁর কথাই প্রথম ভাবতে হবে, ফরমান দিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র


TWENTY RUPEES

■ হেমার সঙ্গে মুসলিম মতে বিয়ে করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। গোপন সেই বিয়ের কাগজ বেরিয়ে যায় এক সময়

হয়ে যায়। কারণ সন্তান। ১৯৫৭ সালে জন্ম হয় তাঁদের বড় সন্তান সানির। ১৯৬৯ সালে জন্ম হয় ববি দেওলের। তাঁদের দুই মেয়ে, বিজেতা ও অজিতার জন্ম হয় যথাক্রমে ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে।

হেমার প্রেম ও ক'জন পুরুষ

চার সন্তানের পিতা ধর্মেন্দ্র তখন বড় তারকা। সচ্ছল পরিবার, পরপর সিনেমা আসছে ধর্মেন্দ্রর। ফলে অভিনেতা হিসেবে সাফল্যের শীর্ষে। এমন সময়েই ঘটে ঘটনাটি। ১৯৬৯ সালে 'আসমান মহল' নামে একটি ছবির প্রিমিয়ারে প্রথমবার হেমা মালিনীকে দেখেন ধর্মেন্দ্র। এবং প্রথম দেখায় এতটাই মোহিত হয়ে যান যে, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধু শশী কপূরকে বলেন, 'কুড়ি চঙ্গি হ্যায়।' ধর্মেন্দ্র তখন মারাত্মক সুপুরুষ। চারিদিকে আলো বিচ্ছুরণ করছেন। তা দেখে মোহিত হয়ে যান হেমা মালিনীও। পরে নিজের আত্মজীবনীতে হেমা লিখেছেন, 'ধর্মেন্দ্রকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, যদি কোনওদিন বিয়ে করেন, তাহলে ধর্মেন্দ্রর মতো কোনও পুরুষকেই করবেন। আরও সহজ করে বললে, কোনও সুপুরুষকে।' বলা বাহুল্য, হেমা জানতেন ধরম বিবাহিত। তাই ধর্মেন্দ্রর কথা তাঁর মাথায়

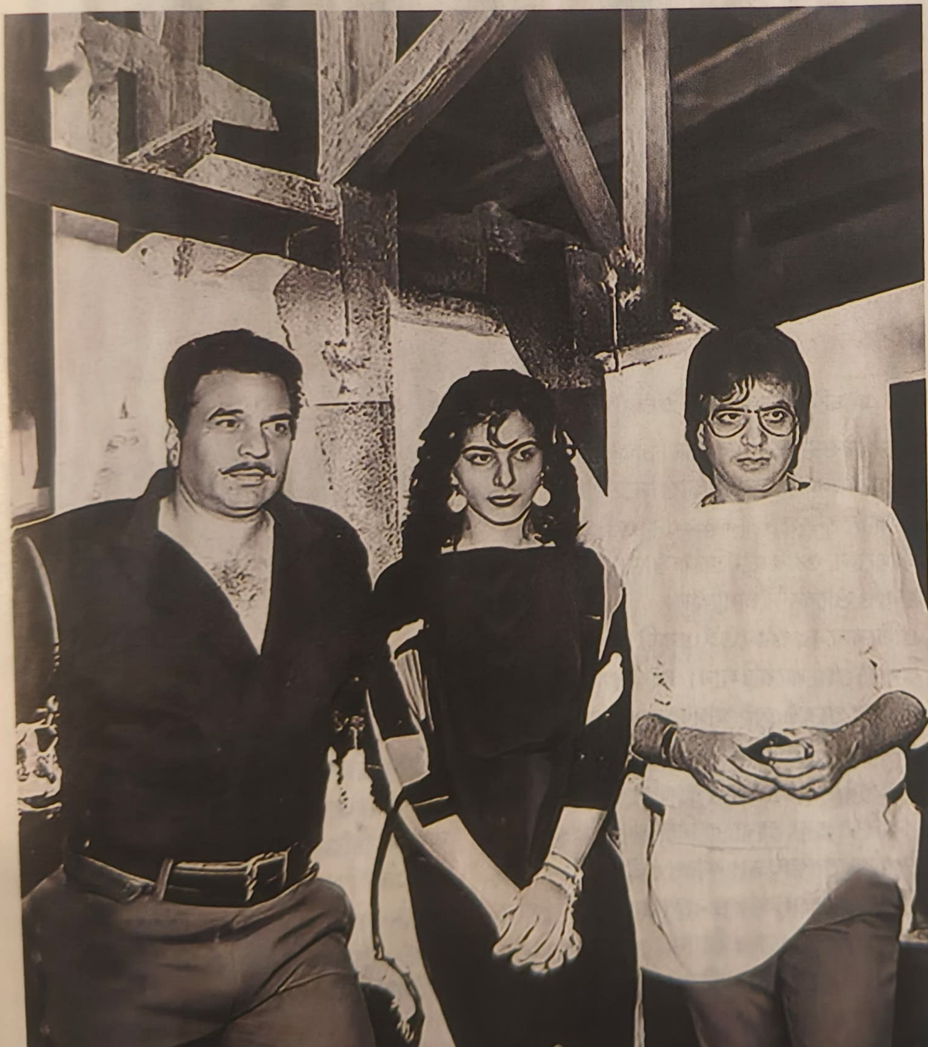
হেমা জানতেন ধরম বিবাহিত। তাই ধর্মেন্দ্রর কথা তাঁর মাথায় আসেনি। শুধু সুন্দর দেখতে হবেন, এই ছিল হেমার ইচ্ছে। কিন্তু সেই ইচ্ছে বদলে গেল

আসেনি। শুধু সুন্দর দেখতে হবেন পাত্র, এই ছিল হেমার ইচ্ছে। হেমাকে দেখার পর ধর্মেন্দ্র আর একটুও দেরি করেনি। প্রথমে আলাপ করেন এবং পরে, মুখে না বললেও, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পরপর চারটি ছবি, 'তুম হসিন ম্যায় জওয়ান', 'রাজা জানি', 'নয়া জ়মানা' এবং 'শরাফত'-এ হেমার সঙ্গে কাজ করেন তিনি। প্রযোজক পরিচালকদেরও অঘোষিতভাবে জানিয়ে দেন, হেমাকে নিয়ে ছবি করার কথা ভাবলে সবার আগে তাঁর কথা ভাবতে হবে। হেমা নিজেকে আটকে রাখতে পারতেন কি আর? তিনিও ধর্মেন্দ্রর প্রতি অমোঘ টানে ভেসে চলে গেলেন। তবে নায়ককে নিয়ে মোহিত হয়ে গেলেও, তাঁকে বিয়ে সম্ভব কি না, ভেবে একটু দ্বিধায় ছিলেন। এই সময় হেমার জীবনেও পরপর দু'জন পুরুষ আসেন। প্রথম জনের নাম সঞ্জীবকুমার। 'সীতা অওর গীতা' ছবির শুটিংয়ের সময়েই সঞ্জীব গভীরভাবে প্রেমে পড়ে যান হেমার, যেমন অন্য নায়িকাদের দেখলেও পড়তেন। অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, বন্ধু জিতেন্দ্রকে দিয়ে তিনি হেমার কাছে নিজের মনের কথা বলতে পাঠান। জিতেন্দ্র সেই সূত্রে হেমার মুম্বাইয়ের বাড়িতে যান এবং সঞ্জীবের কথা বলেন। কিন্তু হেমা শুনেই তা নাকচ করে দেন। সঞ্জীব বন্ধু। তাঁকে নিয়ে জীবন কাটানোর কথা যে তিনি ভাবেন না, তা স্পষ্ট করে দেন। কথাটা শুনে জিতেন্দ্র ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। কারণ মনে-মনে তিনিও হেমার প্রেমে পড়েছিলেন। 'ড্রিম গার্ল' বলে কথা। তিনি অবশ্য তখনই কিছু বলেননি। কিন্তু হেমার সঙ্গে সময় কাটানোর কথা ভাবতে শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে তাঁরা একসঙ্গে একটি ছবি করেন। নাম 'দুলহন'। এই ছবির শুটিংয়ে জিতেন্দ্র বিগলিত হয়ে হেমাকে প্রপোজ় করে ফেলেন।



সায়রা বানুর সঙ্গে ধর্মেন্দ্র

হেমা পড়েন ফাঁপড়ে। জিতেন্দ্রও যে সুপুরুষ! এদিকে তিনি ধর্মেন্দ্রর প্রেমে আচ্ছন্ন। দ্বিধাগ্রস্তও বটে। তাই হয়তো জিতেন্দ্রকে হেমা তখন 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলেননি। বরং তাঁকে সময় দিচ্ছিলেন। এই সময় জিতেন্দ্র আশকারা পেয়ে হেমার চেন্নাইয়ের বাড়িতে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করেন। নিজের বাবা মা এবং হেমার পরিবারকে নিয়ে। উদ্দেশ্য, হেমাকে বিয়ে করবেন। হেমা রাজি হয়ে যান। সকলে মিলে চেন্নাই চলে যান তাঁরা। হেমা আসলে চাইছিলেন, ধর্মেন্দ্রর আকর্ষণটা কাটাতে। ভেবেছিলেন, বিয়ে করে নিলে বুঝি সেই আকর্ষণ কেটে যাবে। কিন্তু ভাগ্যে যা থাকে, তাকে কি আর খণ্ডানো যায়? সেই মিটিং যখন চলছিল, তখনই হেমার বাড়ির ল্যান্ড লাইনে পরপর ফোন আসতে শুরু করে। ধর্মেন্দ্র মুম্বই থেকে পাগলের মতো ফোন করে যাচ্ছিলেন। হেমা যাতে বিয়ে না করেন, তার জন্য হুমকি, অনুরোধ, উপরোধ সব করছিলেন তিনি। হেমা আবার দ্বিধায় পড়ে যান। এদিকে জিতেন্দ্রও তখন মরিয়া। হেমাকে বিয়ে করার জন্য তিরুপতি মন্দিরে যাওয়ার জন্যও তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় আর একটি ফোন আসে। সেটি ধর্মেন্দ্রর নয়। জিতেন্দ্রর প্রেমিকা শোভা



অনিতা রাজের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র ও জিতেন্দ্র

সিম্পির। তিনি প্রেমিককে হাতেনাতে ধরেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দোষারোপ করতে থাকেন। আজও জানা যায়নি, এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও বেছে বেছে ধর্মেন্দ্র বা শোভার কাছে এই খবর পৌঁছে কে দিয়েছিলেন! বলা বাহুল্য এই ফোনের ঠেলায় হেমা এবং জিতেন্দ্রর প্রেম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। জিতেন্দ্ররা ফিরে আসেন মুম্বইতে এবং এই ঘটনার চার মাসের মধ্যে শোভাকে বিয়ে করেন তিনি। অথচ অবাক করা বিষয় দেখুন, ধর্মেন্দ্র নিজের অহং বোধ তৃপ্ত করে হেমাকে আবার নিজের কাছে নিয়ে এলেও, পরিবারকে (পড়ুন প্রকাশ, সানি, ববিদের) ছাড়ার কথা কখনও ভাবেননি। এবং হেমা তা মেনেও নিয়েছিলেন। তবে এই প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ান হেমার পিতা-মাতা। ভি এস রামানুজম এবং জয়া চক্রবর্তী। তাঁরা আইঙ্গার ব্রাহ্মণ। বিবাহিত ধর্মেন্দ্রকে তাঁরা কোনওভাবেই মেনে নেবেন না। তাই হেমার সঙ্গে শুটিংয়ে যাতায়াত করতে শুরু করেন। বাড়িতে প্রবল চাপ দেন। এবং ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের নিয়ে এসে হেমার সঙ্গে

ধর্মেন্দ্র নিজের অহং বোধ তৃপ্ত করে হেমাকে আবার নিজের কাছে নিয়ে এলেও, পরিবারকে (পড়ুন প্রকাশ, সানি, ববিদের) ছাড়ার কথা কখনও ভাবেননি।



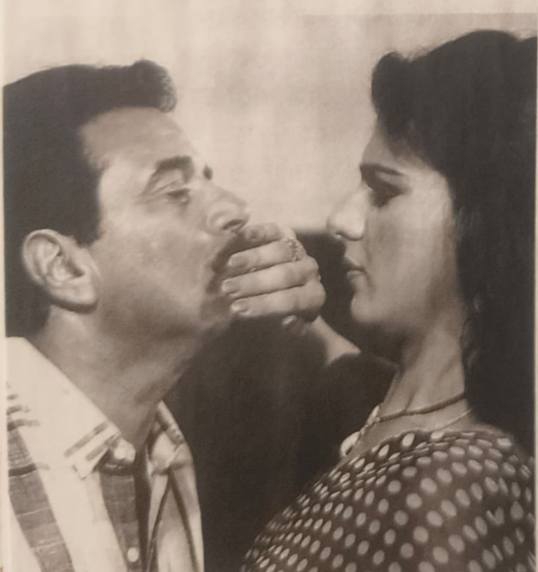
এই ছবির সময়ই ধর্মেন্দ্র ও হেমার প্রেম তীব্র হয়

বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হেমাও তখন নাছোড়বান্দা। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছিলেন বটে , কিন্তু যখন একবার নিয়ে নিয়েছেন, তখন ধর্মেন্দ্রকে ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেননি অন্যকিছু।

প্রতিবেদনের শুরুতেই একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এই প্রেম পর্ব শুরু হওয়ার পরেই সেই সাক্ষাৎকারটি হয়। সেখানে ধর্মেন্দ্র চুপ করে সব মেনে নিলেও, শেষ পর্যন্ত একটি কথা বলেছিলেন যে, তিনি বিবাহিত এবং হেমাকে নিয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে চান না। কারণ এই অপ্রিয় সত্যটি (হেমাকে বিয়ে করতে না পারার) তিনি মেনে নিলে, তাঁকে নিজের জীবনই শেষ করে দিতে হবে। জানা নেই, কথাটি শুনে অলক্ষে কেউ হেসেছিল কিনা। কারণ অচিরেই হেমা মালিনীর পিতা মারা যান। হয়তো মেয়েকে নিয়ে এত লেখালেখি, এত গসিপ তিনি মেনে নিতে পারেননি। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে এরপর যেটা হয় সেটা বেশ অভূতপূর্ব। পিতা মারা যাওয়ার পরেই হেমার মানসিক স্থিতি ভীষণ খারাপ দিকে চলে যায় এবং সেখানে আগলে দাঁড়ান ধর্মেন্দ্র। বলা ভাল, পিতার ছায়া সরে যাওয়ায় চক্রবর্তী পরিবারের দরজাও তাঁর সামনে খুলে যায়। তাই হয়তো পরিবারের সকলের বিপক্ষে গিয়ে ১৯৭৯ সালে গোপনে বিয়ে করেন ধর্মেন্দ্র এবং হেমা। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী জীবিত স্ত্রী থাকাকালীন দ্বিতীয় বিয়ে করা সম্ভব নয় বলে ধর্মেন্দ্র মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় দিলওয়ার খান। হেমা হয়ে যান আয়েশা বি। এই বিয়ের পর তাঁরা দুজনে ভেবেছিলেন সমস্যা এড়ানো যাবে। কিন্তু এড়ানো তো যায়নি, বরং ধর্মেন্দ্রর পরিবারে বিপুল সমস্যা শুরু হয়।

প্রকাশের বাজিমাত

গভীর ভালোবাসা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে হেমা স্পষ্ট করেছিলেন, তিনি ধর্মেন্দ্রর কোনও



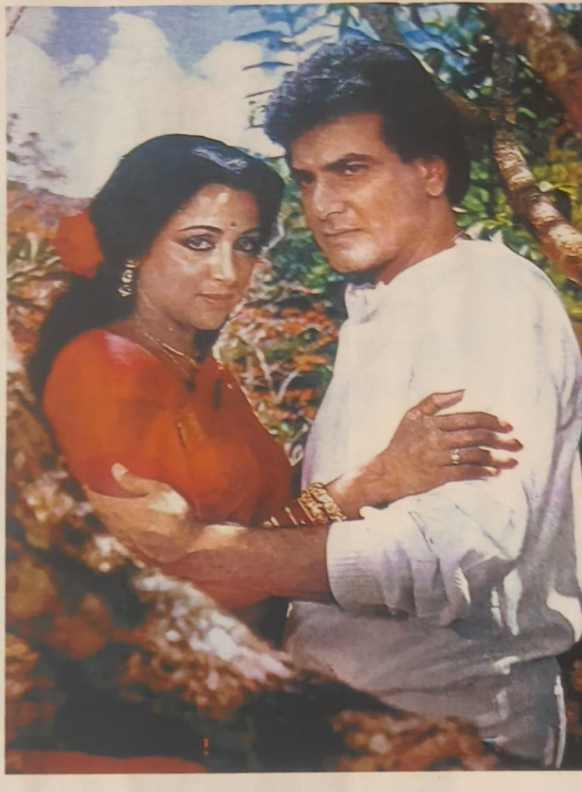
অনিতার সঙ্গে প্রেম মেনে নেয়নি পরিবার

অর্থ বা সম্পত্তি চান না। শুধু নিখাদ ভালবাসা আর সিঁদুরের অধিকার থাকলেই চলবে! কিন্তু সেটা অন্যরা মানবে কেন? প্রকাশ কৌর অবশ্য হেমাকে কাঠগোড়ায় তুলে, নিজের স্বামীর পক্ষই নিয়েছিলেন। পাশাপাশি হিন্দু স্ত্রী হওয়ায়, আইনের যাবতীয় সুবিধা নিয়ে ধর্মেন্দ্রর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। দিনের শেষে স্বামী যাতে বাড়িতে ফিরে আসেন, সেটা নিশ্চিত করতে জীবনের প্রথমবার একটি ইন্টারভিউ দিয়ে বসেন প্রকাশ। সেখানে প্রকাশকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘শুধু আমার স্বামীই কেন? যে-কোনও পুরুষই আমার চেয়ে হেমাকে বেশি পছন্দ করবেন।’ করার সিদ্ধান্তটা নিয়ে। শোনা যায়, হেমার চেয়েও বেশি তাঁর মা এবং দাদারা একটি স্বীকৃতি চেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্রর কাছ থেকে।

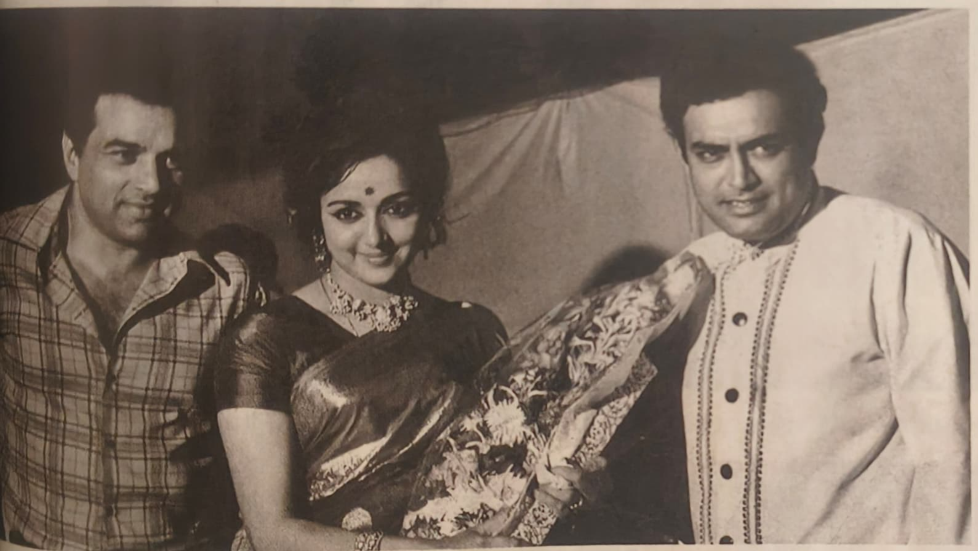
অনিতা ও অন্যান্য

কিন্তু ধর্মেন্দ্র কি কোথাও বাঁধা পড়ার মানুষ? অপ্রিয় শুনতে লাগলেও সত্যি, হেমাকে একেবারে নিজের করে পাওয়ার পর ধর্মেন্দ্র বহুবার বহু সময় প্রকাশকে যতটা কাছে টেনেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন স্ত্রী হিসেবে, হেমাকে দেননি। বরং নিজের প্রেমিক সত্তা আরও বিকশিত করেছেন পরবর্তীকালে অনিতা রাজের সঙ্গে প্রেম করে। অভিনেত্রী

প্রকাশ কৌর অবশ্য হেমাকে কাঠগোড়ায় তুলে নিজের স্বামীর পক্ষই নিয়েছিলেন। পাশাপাশি হিন্দু স্ত্রী হওয়ায়, আইনের যাবতীয় সুবিধা নিয়ে ধর্মেন্দ্রর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।



জিতেন্দ্র চেয়েছিলেন হেমাকে বিয়ে করতে



সঞ্জীবকুমার ভালবাসতেন হেমা মালিনীকে। কিন্তু হেমা? তিনি কী বলেছিলেন উত্তরে?

সঙ্গে আরও বলেছিলেন যে, ধর্মেন্দ্র সেরা স্বামী না-ও হতে পারেন, তবে তিনি চমৎকার বাবা। তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল এবং তাদের কখনওই অবহেলা করেননি। দিনের শেষে তাদের সঙ্গে সময়ও কাটান। পাশাপাশি অবশ্য এও স্পষ্ট করেছিলেন যে, ‘হেমার জায়গায় থাকলে আমি কোনওদিন এই বিয়ে করতাম না’। এই কথা বলে যাবতীয় আবেগ তিনি নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলেন। এবং ধর্মেন্দ্রকেও চাপে রেখেছিলেন। ধর্মেন্দ্র যে সত্যিই চাপে ছিলেন তা বোঝা যায়, হেমার বাড়িতে ১৯৮০ সালে (মুসলিম মতে বিয়ের ছ’ মাসের মধ্যে) আয়েঙ্গার মতে ফের বিয়ে

অনিতা রাজ ধর্মেন্দ্রর চেয়ে বয়সে প্রায় ২৭ বছরের ছোট। ‘নওকর বিবি কা’ নামের ছবিতে অভিনয়ের সময় এই দুই তারকার প্রেম এমন জায়গায় পৌঁছোয় যে, হেমা মালিনীকে পর্যন্ত সেই সম্পর্কের মধ্যে ঢুকতে হয়। শোনা যায়, সেটের মধ্যেই হেমার সঙ্গে চূড়ান্ত ঝামেলা হয় অনিতার। এবং সেটি নাকি প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল! ধর্মেন্দ্র তখন হেমার সন্তানের পিতা। এষা দেওল হয়ে গিয়েছেন। এই অবস্থায় অনিতার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর আবার প্রেম হেমা মানতে পারেননি। কিন্তু প্রকাশ এই ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেননি একটাই কারণে। কারণ তিনি জানতেন, যেখানে যা-ই হোক না কেন, দিনের শেষে ধর্মেন্দ্র বাড়িতেই ফিরবেন। তাই নায়কদের ‘এমন প্রেম হতেই পারে’ ভেবে শান্ত ছিলেন তিনি।

নিজের কেরিয়ারে আশা পারেখ থেকে শুরু করে রাখি গুলজার, সায়রা বানু... এমন বহু নায়িকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে ধর্মেন্দ্রর। মীনা কুমারীর সঙ্গে প্রেমের গল্প তো আপনারা আগেই পড়েছেন। ফলে একথা বলাই যায় যে, অতি সুপুরুষ এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ধর্মেন্দ্র বহু নায়িকার আবেগের সুযোগ নিয়েছেন। ভাল, মন্দ বিচারের জায়গা এটা নয়। কিন্তু যেটা বলার, তা হল প্রেমিক-প্রবর ধর্মেন্দ্র মানুষের সামনে মোটেই ভাল কোনও উদাহরণ রাখেননি। নয়তো হেমার মেয়ে এষার বিয়েতে কন্যাদানের সময় তিনি উপস্থিত থাকলেন না কেন? কেন সকল ভালবাসার মহিলাকে রেখে দিলেন নিস্ফল, হতাশের দলে? প্রেম-ভালবাসা এগুলো বিচারের ঊর্ধ্বে। কিন্তু প্রেম করার পরে যেভাবে বিভিন্ন সময়ে সেই নারীকে অস্বীকার করেছেন ধর্মেন্দ্র, অস্বীকার করেছেন তাঁদের ভালবাসাকে, তাতে হয়তো নায়কের স্টারডমের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে কলঙ্কিতই থেকে গিয়েছেন সারা জীবন।



■ প্রকাশ কৌরের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা

প্রকাশ বনাম হেমা বৈধ বনাম অবৈধ

আইনের চোখে **ধর্মেন্দ্র**র জীবনে হেমা মালিনীর অবস্থান ঠিক কোথায়? তুলে ধরার চেষ্টা করলেন কৌশিক পাল

ভালবাসা আইনের আনুগত্য স্বীকার করে না। আদালতের আইন কিংবা সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়া টপকে যাওয়া স্পর্ধিত অহংকার প্রেমিক-প্রেমিকেরা দেখিয়ে এসেছেন প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু দিনের শেষে, রক্তের তেজ যখন ইস্তফা দেয়, তখন আবার মাথা চাড়া দেয় আইনি কাগজ। উঠে আসে বৈধ এবং অবৈধের প্রশ্ন। ঠিক যেভাবে উঠে আসছে, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে হেমা মালিনীর সম্পর্কের আইনি বৈধতার বিষয়টি। গত ২৫ নভেম্বর (২০২৫) নিজের বাড়িতে প্রয়াত হন ছয়-সাতের দশকের সুপারস্টার ধর্মেন্দ্র। মৃত্যুর আগে প্রায় এক সপ্তাহ ভেন্টিলেশনে ছিলেন অভিনেতা। মুম্বইতে



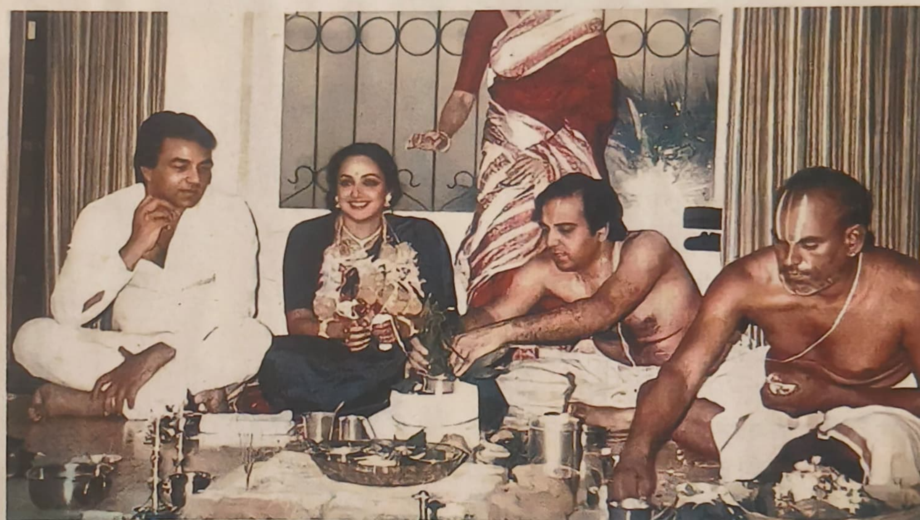
ধর্মেন্দ্র ও হেমার উদ্দাম প্রেম

তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় সেদিনই। তার প্রায় আট দিনের মাথায় হরিদ্বারের হর কী পৌড়ীতে প্রয়াত অভিনেতার অস্থি বিসর্জন করতে দেখা যায় সানি-ববি সহ দেওল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। বলা বাহুল্য, সেখানে দেখা যায়নি অভিনেতার 'দ্বিতীয় স্ত্রী' হেমা মালিনী বা তাঁর দুই কন্যা, এষা ও অহনার কাউকেই। উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর মুম্বইতে যে স্মরণসভার আয়োজন করেছিল দেওল পরিবার, তাতেও দেখা যায়নি হেমা মালিনী ও তাঁর দুই মেয়েকে। বরং উল্টে, একইদিনে নিজের বাড়িতে আলাদা করে একটি স্মরণসভার আয়োজন করেন হেমা! তার মানে কি, ধর্মেন্দ্র বেঁচে থাকাকালীন সম্পর্কের যে দুর্বল সুতোটুকু বাঁধা ছিল প্রকাশ কৌর ও হেমা মালিনীর মধ্যে, তা চিরতরে ছিন্ন হল? শুরু হল বৈধ এবং অবৈধর লড়াই?

আজ থেকে সাড়ে চার দশক পিছিয়ে গেলে দেখা যায়, ৪৭ বছরের বিবাহিত নায়ক ধর্মেন্দ্র ৩১ বছরের সুপারস্টার নায়িকা হেমা মালিনীর প্রেমে পাগল! এ তেমন নতুন কোনও ঘটনা নয়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এমন প্রেম আকছার হয়। ধর্মেন্দ্রর নিজেরই এমন অভিজ্ঞতা এর আগেও হয়েছে। যখন বলিউডের তৎকালীন মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী, কামাল আমরোহীর স্ত্রী, মীনাকুমারী হয়ে উঠেছিলেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় নবাগত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর চালিকাশক্তি! তবে হেমার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর প্রেম ছিল এর থেকে অনেকটা আলাদা। এক্ষেত্রে তা উন্মত্ত হয়েছিল দুই পক্ষের সমান আশকারাতেই। সেই প্রেমের গল্প আপনারা এর আগের অধ্যায়েই বিশদে পড়েছেন। তাই সেই বিষয়ে আর ঢুকব না। আমরা নজর ধরে রাখব তাঁদের দ্বিতীয় 'বিয়ে'র প্রসঙ্গে।

সেই সময়কার পত্রপত্রিকা ঘেঁটে জানা যায়, চার সন্তানের (সানি, অজিতা, বিজেতা, ববি) জননী প্রকাশ কৌরের স্বামী ধর্মেন্দ্র (১৯৫৪ সালে বিয়ে হয় তাঁদের। তখন ধর্মেন্দ্রর বয়স ১৯ বছর, প্রকাশের বয়স ১৭) নিজের চেয়ে ১৬ বছরের ছোট হেমা মালিনীকে মুসলিম মতে এবং গোপনে বিয়ে করেন ১৯৭৯ সালের ৩১ অগস্ট। সেই বিয়ের সময় ধর্মেন্দ্রর নাম হয় দিলাবর খান ও হেমা হন আয়েশা বি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন মুসলিম মতে বিয়ে এবং কেনই বা দু'জনের এই নামকরণ? আসলে হিন্দু ধর্ম মতে প্রথমা স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় কোনও পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ে স্বীকৃত



মুম্বইয়ের ফ্ল্যাটে হেমার সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানে ধর্মেন্দ্র



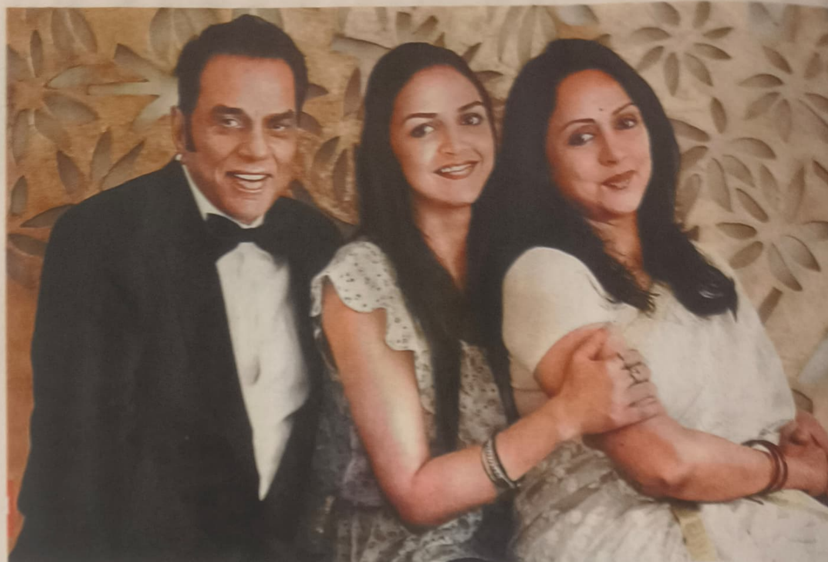
সপরিবার। কিন্তু বৈধতা পাবে কি এই পক্ষের সদস্যরা?

নয়, যদি না আইনত প্রথম পক্ষের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। যে দু'টি শর্তের কোনওটিই ধর্মেন্দ্র ও প্রকাশের ক্ষেত্রে খাটে না। অগত্যা, ওই পথ অবলম্বন।

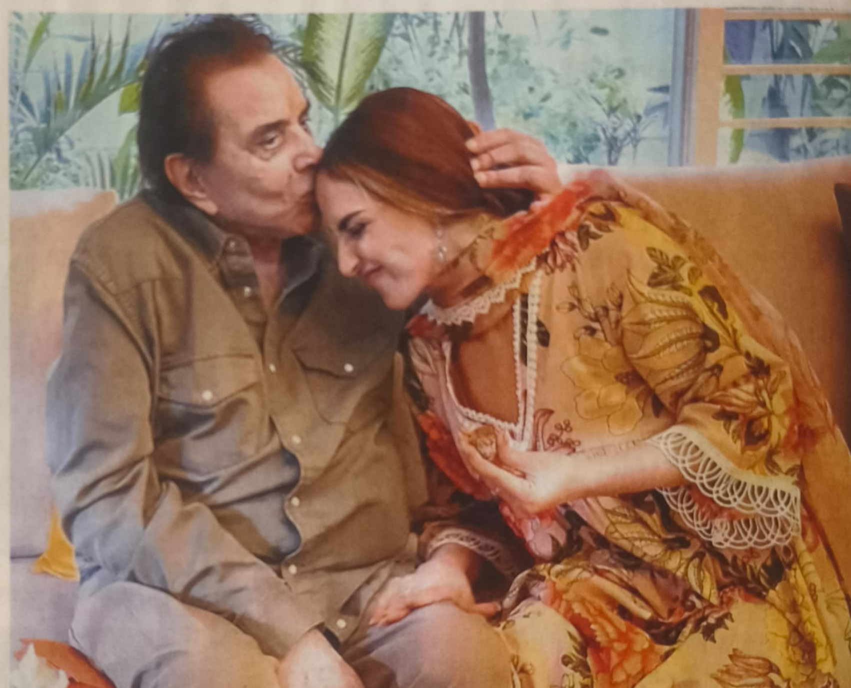
এই ঘটনার প্রায় এক বছর পর, ১৯৮০ সালের ২ মে সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে মুম্বইয়ের জুহুতে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাটে আয়েঙ্গার মতে (হেমা জন্মসূত্রে তামিল আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ) তাঁদের আবার বিয়ে হয়। এই বিয়ে দেওয়ার জন্য চেন্নাই থেকে নিয়ে আসা হয় হেমাদের পরিবারের পারিবারিক পূজারী শ্রীনিবাস চারী এবং তাঁর ছেলে রামানুজমকে। খুবই অনাড়ম্বরভাবে এই বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। বিয়েতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কোনও তারকাকেই। উপস্থিত ছিলেন হেমার মা জয়া চক্রবর্তী, হেমার কাকা, দুই ভাই, আইনবিদ ভেঙ্কটশরণ এবং হেমার পরিবারের আরও কয়েকজন। ধর্মেন্দ্রর তরফ থেকে একমাত্র উপস্থিতি ছিল তাঁর বাবা, কেওল কীশন সিং দেওলের।

আইনের কথায় পরে আসব। তার আগে বলি, এই বিয়ে কি মেনে নিতে পেরেছিলেন ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী প্রকাশ কৌর? এই বিয়ের বেশ কিছুদিন পরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রকাশ বলেছিলেন, "ধর্মেন্দ্র হয়তো ভাল স্বামী নন, কিন্তু উনি একজন চমৎকার পিতা। এখনও দিনের শেষে উনি বাড়ি ফিরে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটান। এর চেয়ে বেশি আমি আর কী চাইতে পারি!" একরাশ অভিমান বুকে চেপে, স্বামীর 'কীর্তি' যে তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা একরকম তাঁর কথাতে স্পষ্টই ছিল।

অন্যদিকে, ধর্মেন্দ্র যখন হেমাকে বিয়ে করেন, তখন ধর্মেন্দ্র-প্রকাশের বড় ছেলে সানি দেওলের বয়স ২৭ বছর ও ছোট ছেলে ববির ১১ বছর। স্বভাবতই এই বিয়ে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেননি ধর্মেন্দ্র-প্রকাশের



হেমা ও এষার সঙ্গে ধর্মেন্দ্র। মেয়ের বিয়েতে সেভাবে উপস্থিত ছিলেন না অভিনেতা



মেয়েকে আশীর্বাদ করছেন। কিন্তু সম্পত্তির ভাগ কি পাবেন এষা?

ছেলেমেয়েরা। বহুবছর পর সানির সঙ্গে হেমা ও তাঁর মেয়েদের (এষা এবং অহনা) সম্পর্কের বরফ কিছুটা গললেও, ববি বরাবরই ছিলেন একবগ্গা। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর তা যে আরও খারাপ হবে, হচ্ছেও, তা ঘটনাপরম্পরার দিকে চোখ রাখলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। এবং এই সূত্রেই আসছে আইনের কথা। বৈধ-অবৈধের প্রশ্ন। সম্পত্তির দাবি-দাওয়ার প্রসঙ্গ।

ধর্মেন্দ্র যেভাবে (প্রথমে ইসলাম ও পরে আয়েঙ্গার মতে) বিয়ে করেছিলেন হেমা মালিনীকে, আইনের চোখে তার কি আদৌ কোনও বৈধতা আছে? বিশিষ্ট আইনজীবী দ্যুতিমালা বাগচির কথায়, "যেহেতু প্রকাশ কৌর জীবিত এবং তাঁর সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর কখনও আইনি বিচ্ছেদ হয়নি, এবং তাঁরা দু'জনেই হিন্দু, সেক্ষেত্রে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনীর আয়েঙ্গার (হিন্দু) মতে বিয়ে কোনও মতেই বৈধ নয়। আর যদি মুসলিম মতে বিয়ের কথা হয়, তাহলে দেখতে হবে পরবর্তী সময়ে তাঁরা একসঙ্গে ইসলাম ধর্ম আদৌ পালন করেছেন কিনা। ইসলাম মতে বিয়ে করলে, বাকি জীবনটাও তো সেই ধর্ম মনেই চলতে হবে। যতদূর দেখলাম, ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্য হিন্দু মতেই হয়েছে। এবং হেমা মালিনীর সঙ্গে 'বিয়ে' করার পরেও তিনি প্রকাশ কৌরের

ধর্মেন্দ্র যখন হেমাকে বিয়ে করেন, তখন ধর্মেন্দ্র-প্রকাশের বড় ছেলে সানি দেওলের বয়স ২৭ বছর ও ছোট ছেলে ববির ১১ বছর। স্বভাবতই মানা যায়নি কিছু

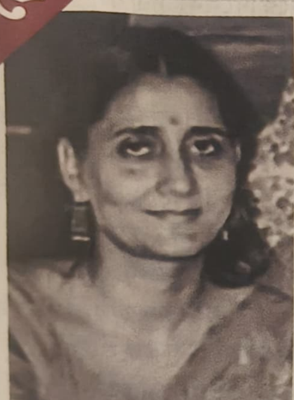
সঙ্গেই থেকেছেন! ভাবখানা এরকম, 'আমি সেলিব্রিটি, তাই যা খুশি করতে পারি!' তবে একথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, আইনের চোখে হেমা মালিনীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর বিয়ে কোনওদিক থেকেই বৈধ নয়। এবং সেক্ষেত্রে ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তির অধিকারও তিনি দাবি করতে পারেন না, যদি না ধর্মেন্দ্র নিজে কোনও উইল করে হেমা মালিনীকে সম্পত্তি

আইনের চোখে হেমা মালিনীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর বিয়ে কোনওদিক থেকেই বৈধ নয়। ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তির অধিকারও তিনি দাবি করতে পারেন না, যদি ধর্মেন্দ্র...



ববি ও সানির সঙ্গে ধর্মেন্দ্র। পিতাকে নিজেদের কাছেই রেখেছিলেন তাঁরা

বৈধ



প্রকাশ কৌর

জন্ম: ১৯৩৭ সাল

ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে: ১৯৫৪

বিয়ের সময় বয়স: ১৭ বছর

সন্তান: সানি, বিজেতা, অজিতা ও ববি দেওল

পেশা: গৃহকর্ত্রী

অবৈধ



হেমা মালিনী

জন্ম: ১৯৪৮ সাল

ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে: ১৯৮০

'বিয়ে'র সময় বয়স: ৩২ বছর

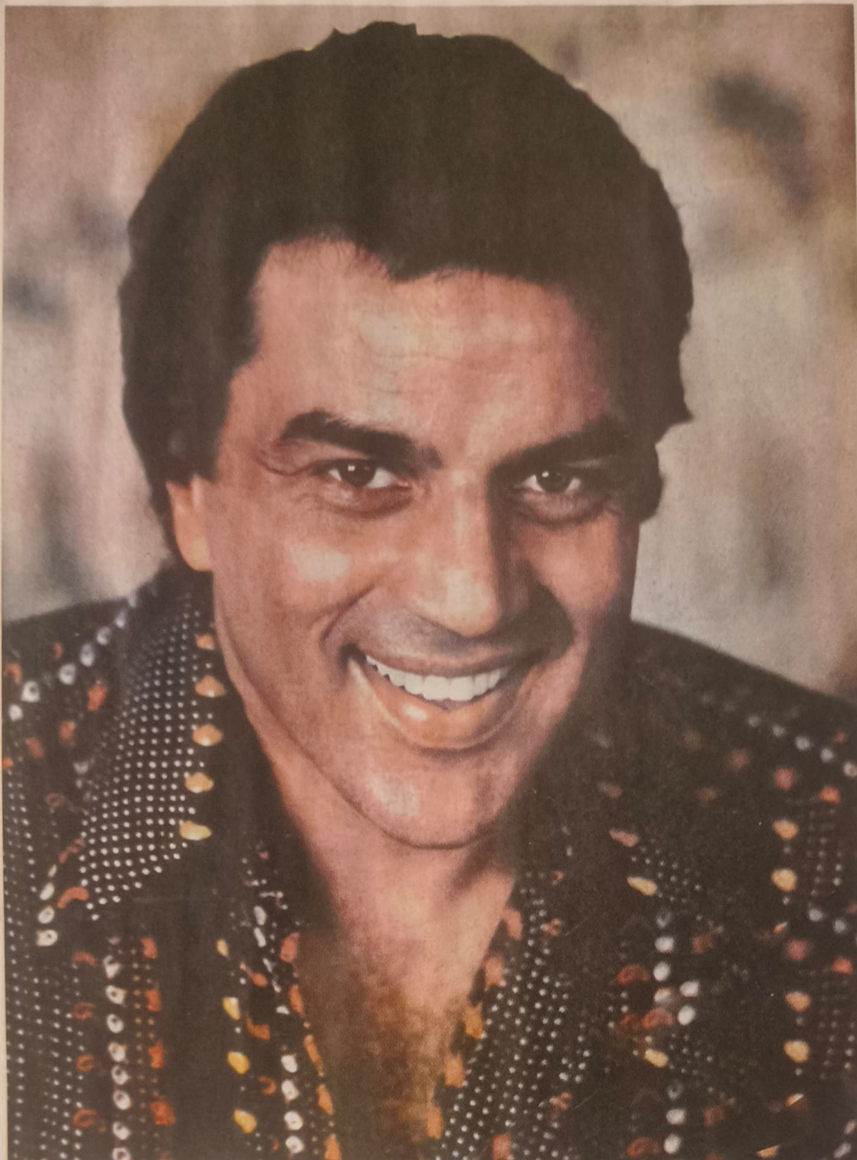
সন্তান: এষা ও অহনা

পেশা: অভিনেত্রী

দান করে গিয়ে থাকেন। তবে একথা কিন্তু ধর্মেন্দ্র-হেমার দুই মেয়ে, এষা বা অহনার ক্ষেত্রে খাটে না। হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট অনুসারে, সন্তান, তা সে বৈধই হোক বা অবৈধ, বাবার সম্পত্তির দাবি সকলের ক্ষেত্রেই সমান।" অর্থাৎ, ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তিতে হেমা মালিনীর কোনও আইনি অধিকার না থাকলেও তাঁর দুই মেয়ে, এষা ও অহনার তা আছে।

এক্ষেত্রে একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করব। ২০০৪ সালের ঘটনা। ধর্মেন্দ্র তখন ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে বিকানের লোকসভা কেন্দ্র থেকে ভোট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সেই সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করা হলফনামায় নিজের স্ত্রী-র নামের কলামে ধর্মেন্দ্র লেখেন 'প্রকাশ কৌর'। স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীদল ধর্মেন্দ্রর দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। 'দিলাবর খান' হিসেবে তিনি যদি হেমা মালিনীকে মুসলিম মতে বিয়ে করেই থাকেন, তাহলে তা এখন লুকোচ্ছেন কেন? এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা ধর্মেন্দ্রর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলে, তিনি অত্যন্ত রেগে যান। এবং বলেন, "দেখুন, ওখানে স্ত্রীর নাম লেখার কথা বলা ছিল। আর হিন্দু আইন অনুসারে একজনই তো স্ত্রী হতে পারেন। তাই না? তাই হিন্দু আইন মেনে আমি ওখানে প্রকাশের নাম লিখেছি। যদি ওরা (নির্বাচন কমিশন) ওখানে আরও কিছু লেখার জায়গা রাখতেন, তাহলে আমি আরও অনেকের নাম লিখতে পারতাম। হাজার বউ আছে আমার। কার কার নাম লিখব!"

এই ভিডিয়ো ক্লিপিং আজও আছে ইন্টারনেটে। হাজার না হোক, আরও খানকয়েক 'স্ত্রী'-ও যদি তাঁর থেকে থাকে এবং তাঁদের সন্তানের পিতৃত্বের দাবি ধর্মেন্দ্রর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁরা উদয় হন, তাহলে পরিস্থিতি যে আরও জটিল হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।



একটি মৃত্যু, নানা প্রশ্ন

একজনের মৃত্যুর পর তাঁর চলে যাওয়া নিয়ে কাটাছেঁড়া করা কাম্য নয়। বিশেষ করে সেই মানুষটা যদি হন লেজেন্ডারি অভিনেতা **ধর্মেন্দ্র**। কিন্তু তাঁর মৃত্যু ঘিরে এতরকমের প্রশ্ন উঠছে যে, তা নিয়ে আলোচনা না করে উপায় নেই। কী-কী প্রশ্ন উঠছে এই মৃত্যু ঘিরে? কী কারণে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা? মুম্বই থেকে ঘুরে এসে লিখছেন **আসিফ সালাম**

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে যেমন গোটা দেশবাসী মর্মাহত, ঠিক একইসঙ্গে এই মৃত্যু ঘিরে উঠেছে একরাশ প্রশ্ন। না, তাঁর মৃত্যু বার্ধক্য ও শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতার কারণেই হয়েছে। এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে মৃত্যুর দিন নিয়ে। মৃত্যুর স্থান নিয়ে। ১১ নভেম্বর রটে যায় যে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলিউডের হি-ম্যান। তাই নিয়ে রাজনাথ সিংহ, যোগী আদিত্যনাথ থেকে জাভেদ আখতারের মতো হেভিওয়েটরা টুইটও করেন। এছাড়া সেই হাসপাতালের এক কর্মী একটি ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেন। যেখানে দেখা যায়, হাসপাতালের বিছানায় ধর্মেন্দ্রর নিথর দেহ পড়ে। আর ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রকাশ কৌর এবং দুই ছেলে সানি এবং ববি অসহায়ের মতো কান্নাকাটি করছেন। সমস্ত মিডিয়ার হেডলাইনে দেখা যায় ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর। কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়ে সানি ও হেমা দু'জনেই আলাদা-আলাদা ভাবে জানান, ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু হয়নি। বরং সেই হাসপাতালের চিকিৎসকরা নাকি বলেছেন তিনি এখন সুস্থ হওয়ার পথে। মিডিয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে প্রশ্নও তোলা হয়। তবে শুধু তো মিডিয়া নয়, যোগী আদিত্যনাথ, জাভেদ আখতার, রাজনাথ সিংহের মতো হেমা-ধর্মেন্দ্রর পরিবারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বরাও কিন্তু ধর্মেন্দ্রর আত্মার শান্তি কামনা করে টুইট করেন। বলিউডের অন্দরমহলে কান পাতলে এখন বেশ কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ধরে নেওয়া হল যে, সেদিন ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবরটি ভুয়ো ছিল। তা হলে রাজনাথ, জাভেদরা কারও সঙ্গে কথা না বলেই টুইট করে দিলেন? সূত্র বলছে, জাভেদ এবং যোগী আদিত্যনাথ কিন্তু ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থের আপডেট নিতে নিয়মিত হেমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাহলে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁরা একবারও হেমাকে যোগাযোগ করলেন না! পরের প্রশ্ন, মিডিয়ায় খবর হওয়ার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর হেমা ও সানি নিজস্ব বিবৃতি দেন। এই দু'ঘণ্টা সময় নেওয়ার কারণ কী? তৃতীয় প্রশ্ন, বলা হল যে ধর্মেন্দ্র নাকি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এমনটাই জানানো হয়েছে চিকিৎসকদের তরফ থেকে। কিন্তু মাত্র দশ দিনের মাথায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন ধর্মেন্দ্র (অন্তত পরিবারের তরফ থেকে তাই বলা হয়)। এই দশদিন পরিবারের তরফ থেকে কিন্তু ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও আপডেট দেওয়া হয়নি। আর তাঁর শেষকৃত্যও সম্পন্ন হল লোকচক্ষুর আড়ালে। কেন এই লুকোচুরি? অনেকেই হয়তো এই লেখা পড়ে ভাববেন একজন লেজেন্ডের মৃত্যুর পর তাঁর চলে যাওয়া নিয়ে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে। কিন্তু সেটা করার পিছনে কিন্তু যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ধর্মেন্দ্র-হেমার পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র মারফত জানা যায়, বেশ অনেকবছর ধরেই নাকি ধর্মেন্দ্রর দুই পরিবার, অর্থাৎ হেমা মালিনী এবং প্রকাশ কৌরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাবার সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। সেই ঝামেলার রেশ এত দূর গড়ায়



স্ত্রী প্রকাশ কৌর ও সানি এবং ববির সঙ্গে ধর্মেন্দ্র

যে, শোনা যায় সানি-ববিরা নাকি কোর্টে মামলা মোকদ্দমা করারও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন! চুপ ছিলেন না হেমার পক্ষও। তবে তাঁর মৃত্যু হওয়ার পরেও কেন দশদিন মৃত্যুর খবর চেপে রাখা হবে এবং সেটার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের কী সম্পর্ক, সেটা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

১২০ কোটির ফার্মহাউজ়, ৫০০ কোটির সম্পত্তি?

সাধারণত তারকাদের মৃত্যুর পর তাঁদের সুবিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ঝামেলা মোটেও কোনও নতুন বিষয় নয়। বিশেষত, সেই তারকা যদি নির্দিষ্ট করে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঠিক করে না যান। শোনা যায়, স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে নাকি প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে ধর্মেন্দ্রর। সাড়ে ছয় দশকের ফিল্মি কেরিয়ারে যে শুধুমাত্র অভিনয়ই করেছেন তা তো নয়। প্রযোজক হিসেবেও যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন। এর পাশাপাশি একাধিক এন্ডর্সমেন্ট, রেস্তরাঁ ব্যবসায় বিনিয়োগ, মুম্বইয়ের লোনাভলা অঞ্চলে ১০০ একর জমির উপর তৈরি ফার্মহাউজ়...সবই আছে। শোনা যায়, ফার্মহাউজ়টি নাকি অত্যন্ত বিলাসবহুল। সুইমিং পুল, বাগান, থেরাপি এরিয়া-সহ সবই আছে সেখানে। এখানেই নাকি প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে জীবনের শেষ কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। এই ফার্মহাউজ়টির দাম এখনকার নিরিখে অন্তত ১২০ কোটি টাকা বলে জানা যায়। তবে ধর্মেন্দ্র নাকি শুধু এই ফার্মহাউজ়টুকু বানিয়েই খুশি



হেমার কন্যারা। সঙ্গে সিমি গারেওয়াল। একটি সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে

ধর্মেন্দ্র চেয়েছিলেন দুই পক্ষের সন্তানের মধ্যে যাতে ভাব-ভালবাসা থাকে। তাই রিসর্টটি চালানোর জন্য তিনি ভেবেছিলেন ববি ও এষার কথা। তাঁদের হাতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

ছিলেন না। সূত্র বলছে, এর সামনের জায়গাটুকু নিয়ে প্রায় ৩০-টি কটেজের একটি রিসর্ট তৈরির পরিকল্পনা ছিল তাঁর। ধর্মেন্দ্র বরাবর চেয়েছিলেন, দুই পক্ষের সন্তানের মধ্যে যাতে ভাব-ভালবাসা থাকে। তাই এই রিসর্টটি চালানোর জন্য তিনি ভেবেছিলেন ববি এবং এষার কথা। তাঁদের হাতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সূত্রের খবর, সানি কিছুটা অ্যাডজাস্ট করে নিলেও, ববি নাকি একেবারেই সৎ মা হেমা এবং তাঁর দুই মেয়ে এষা এবং অহনাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাই বাবাকে সরাসরি না বলতে পারলেও, তিনি নাকি পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে সেই রিসর্টের কাজ ধীরে-সুস্থে হয়। যাতে এষার সঙ্গে তাঁকে কোনও দায়িত্ব না সামলাতে হয়। এদিকে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ি-জমি মিলিয়ে ১৭ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে ধর্মেন্দ্রর। চাষের জমি ও কৃষি-অযোগ্য জমির পরিমাণ যা, তা অন্তত ১.৪ কোটি টাকা মূল্যের হবে বলে জানা যায়। ২০২২-এ হরিয়ানার কর্নাল হাইওয়ের ধারে 'হি-ম্যান' নামে একটি রেস্তরাঁ খোলেন ধর্মেন্দ্র। এছাড়া 'গরম ধরম' ধাবা চেনও রয়েছে তাঁর। এ তো গেল জমি, বাড়ি, রেস্তরাঁ ব্যবসার কথা। ধর্মেন্দ্রর সংগ্রহে ছিল একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি। মার্সিডিজ় বেঞ্জ় এস ক্লাস, মার্সিডিজ় বেঞ্জ় এসএল ৫০০, ল্যান্ড রোভার, রেঞ্জ রোভারের মতো অসংখ্য গাড়ি ছিল তাঁর গ্যারাজে। তবে নায়কের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর বহু পুরনো একটি ফিয়াট গাড়ি। অবশ্য, গাড়িটির সঙ্গে অসংখ্য স্মৃতিও জড়িয়ে ছিল। বলিউডে যখন তিনি নবাগত, সবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, সে সময়ের কেনা এই গাড়ি। কিন্তু এবার প্রশ্ন হল, তাঁর এই বিপুল সম্পত্তির মালিকানা কার

কাছে যাবে?

সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত থাকবেন হেমা?

ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর। তাঁদের চার ছেলেমেয়ে, সানি, ববি, অজিতা ও বিজেতা। ঘটনাচক্রে, দ্বিতীয়বার হেমা মালিনীকে বিয়ে করলেও প্রথম স্ত্রীকে তিনি কখনওই ডিভোর্স দেননি। হেমা মালিনীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর বিয়ে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী হয়নি। বিয়ের সময়ে হেমা ও ধর্মেন্দ্র দু'জনেই নাকি নাম পরিবর্তন করে, মুসলিম মতে বিয়ে করেন। কারণ, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী, একজন স্ত্রী থাকাকালীন অপর কাউকে আইনত বিয়ে করলে তা বৈধ হবে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, হেমা মালিনীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর বিয়েও বৈধ নয়! মুম্বইয়ের সূত্র অনুযায়ী, ঠিক এই গেরোয় পড়েই নাকি স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন হেমা! তবে, দ্বিতীয় পক্ষের দুই মেয়ে এষা ও অহনা অবশ্যই সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারেন। দু'পক্ষের মোট ছ'জন সন্তানের কে কত পরিমাণ পাবেন

> ধর্মেন্দ্র নাকি বিপুল সম্পত্তির বড় অংশ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে পঞ্জাবে তাঁর জমিজমা অন্যতম। এক কাকার সন্তানদের মধ্যে...

তাও স্পষ্ট নয়! শোনা যাচ্ছে, ধর্মেন্দ্র নাকি কোনও উইল রেখে যাননি। আবার অন্য একটি সূত্রের মতে, প্রায় এক দশক আগেই নাকি উইল করে রেখেছিলেন তিনি। শরীর ভাঙতে শুরু করার আগেই নাকি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। উইল না রেখে গেলে ছ'সন্তানেরই সম্পত্তিতে সমান অধিকার থাকার কথা! আবার এও শোনা যাচ্ছে, ধর্মেন্দ্র নাকি বিপুল সম্পত্তির বড় অংশ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে পঞ্জাবে তাঁর জমিজমা অন্যতম। এক কাকার সন্তানদের মধ্যে নাকি একটি বড় অংশ তিনি আগেই দিয়েছিলেন। এই অঙ্কটি অন্তত পাঁচ কোটি টাকা এবং যে জমিটি তিনি তাঁদের দেন তার সঙ্গে প্রচুর সেন্টিমেন্ট



হেমার সঙ্গে বিয়ের পরপর



জীবনের শেষদিকে প্রকাশের সঙ্গে নাকি অনেকটাই সময় কাটান ধর্মেন্দ্র

জড়িয়ে আছে। ধর্মেন্দ্রর এক ভাইপো বুটা সিংহ নাকি এই সম্পত্তির বর্তমান মালিক হতে চলেছেন। এর নেপথ্যের কারণ হিসেবে অনেকে বলছেন, ধর্মেন্দ্র বরাবর পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু স্ত্রী, সন্তান নন, বরং, তাঁর বৃহত্তর পরিবারের ভাল থাকার কথাও ভেবেছেন তিনি বরাবর। হেমা মালিনী আদৌ সম্পত্তি পাবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন উঠছে, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দেওয়ার ফলে হেমা সম্পত্তি নাও পেতে পারেন! আবার যদি ধর্মেন্দ্র ও হেমা দু'জনেই ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করে থাকেন (কিছু কিছু রিপোর্টে আগে উল্লেখ করা হয়েছিল) তা হলে তাঁদের বিয়ের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন প্রযোজ্যই হবে না!

সম্পত্তি চাই না, এমনটাই বলেছিলেন হেমা

তবে এর আগে হেমা অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই! এক সাক্ষাৎকারে তিনি

বলেছিলেন, "একটা সময় আমিই ওকে বলেছিলাম, এবার বিয়ে করে নাও। এভাবে কতদিন চলবে? ভালবাসা ছাড়া আর কোনওদিন কোনওকিছু প্রত্যাশা করিনি ওর কাছ থেকে। ও সব সময় আমার পাশে থাকে, আর কী-ই বা চাইতে পারি আমি? সম্পত্তি, টাকাপয়সা আমার চাই না। আই জাস্ট নিড সাম লাভ। দ্যাটস ইট।" কিন্তু দুই পরিবারের এক ঘনিষ্ঠের বক্তব্য অনুযায়ী, ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তির প্রতি যথেষ্ট টান রয়েছে হেমার। এমনিতে হেমা খুব স্বাধীনচেতা মহিলা, যিনি সবসময় নিজের ন্যায্য সম্মানের জন্য লড়ে গিয়েছেন। তাই স্বামীর সম্পত্তি পাওয়াটা শুধু আর্থিক লাভের জন্য নয়, স্ত্রী হিসেবে নিজের মর্যাদা অটুট রাখার জন্য। সূত্র বলছে, হেমার বক্তব্য হল, যে মানুষটার সঙ্গে এতবছর সংসার করলেন, তাঁর কোনও সম্পত্তিতে তাঁর এবং তাঁর মেয়ের অধিকার থাকবে না কেন? এদিকে সূত্র বলছে, প্রকাশ কৌরের এই নিয়ে খুব বেশি বক্তব্য না থাকলেও, ববি নাকি





গতবছরের জন্মদিনের কেক কাটছেন ধর্মেন্দ্র। (নীচে) হাসপাতাল থেকে ধর্মেন্দ্রকে দেখে বেরনোর পথে হেমা

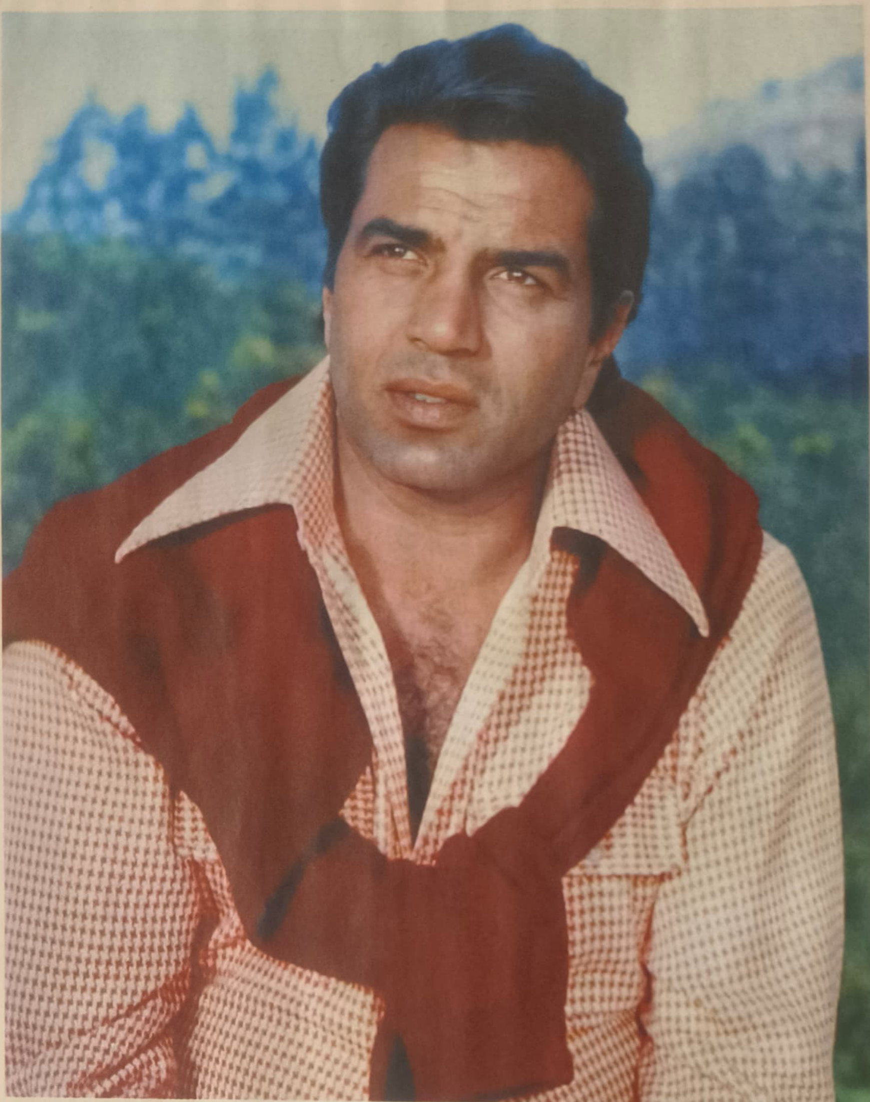
হেমা সবসময় নিজের ন্যায্য সম্মানের জন্য লড়ে গিয়েছেন। স্বামীর সম্পত্তি পাওয়াটা শুধু আর্থিক লাভের জন্য নয়, স্ত্রী হিসেবে নিজের মর্যাদা অটুট রাখার জন্য।



সানি, ববি ও অভয়ের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র

একেবারেই চান না বাবার সম্পত্তির একাংশও হেমা বা তাঁর পরিবার পান। ঘনিষ্ঠমহলে তিনি বরাবর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, হেমার জন্যই বাবা তাঁর মাকে ছেড়ে চলে আসেন। তাই তিনি হেমাকে কখনও গ্রহণ করতে পারবেন না। শোনা যায়, পরবর্তীকালে সানি কিছুটা নরম হলেও ববির মন নাকি গলানো যায়নি। আপাতত দুই পরিবারের তরফ থেকেই নাকি আইনজীবি নিয়োগ করা হয়েছে।

আদৌ ধর্মেন্দ্র কোনও উইল করে গিয়েছেন কি না, হেমাকে বৈধ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে স্বামীর সম্পত্তির একাংশ দেওয়া হবে কী না, এই বিবাদের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু নিয়ে লুকোচুরির সম্পর্ক কী, এসব প্রশ্নের উত্তর সময়ই বলবে। বা হয়তো ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্যের মতো এই উত্তরও ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হবে!



বিতর্কিত বিদায়

বিতর্ক তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কিন্তু নিভৃতে এমন নক্ষত্রের পতন বোধ হয় কাম্য নয়। সবটাই কি গুজবের দোষ? নাকি পারিবারিক বিবাদও ছিল শেষ দিনের সঙ্গী? **ধর্মেন্দ্র**র শেষযাত্রা নিয়ে লিখছেন **সাগরিকা চক্রবর্ত্তী**

'বিতর্কিত অন্তিমযাত্রা!' এই কথাটা শেষ কয়েক বছরে তেমন কোনও তারকার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়নি বললেই চলে। যদিও সুশান্ত সিংহ রাজপুত, শ্রীদেবী, দিব্যা ভারতী, স্মিতা পাতিলের মতো তারকাদের নাম বললে অন্তিমযাত্রা, মৃত্যু, রহস্য... শব্দগুলোর প্রতি কৌতূহল জাগে। যা কিছু অধরা, অজানা, সেগুলোর উপর মানুষের মোহ বরাবর। আবার তা যদি হয় তারকানির্ভর, তাহলে তো কথাই নেই। হালে হি-ম্যান ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু সেই সব কৌতূহলকেই খানিক উস্কে দিল যেন। তিনি আদতে মারা গিয়েছেন নাকি যাননি, সেটাই যেন সোশ্যাল মিডিয়া-সর্বস্ব যুগে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৪ নভেম্বর তারিখের আগে পর্যন্ত। কিন্তু কী লাভ? এত ভাবনার মাঝে তাঁর মৃত্যুটা যেন খানিক অন্তরালেই থেকে গেল। অন্তিম দর্শনটাও হয়ে উঠল কঠিন।

শেষযাত্রার পথে

২৪ নভেম্বর (২০২৫), সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ জানা যায়, ভিলে পার্লের পবন হংস শ্মশানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ভিড় সামলানোর জন্য বিশেষ পুলিস ফোর্স রাখা হয়েছে। বড় তারকার মৃত্যু মানেই বড় শোভাযাত্রা, এ ব্যাপারে তো কোনওদিনই কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই তখনও কেবল অনুমানই ভরসা। বেলা বাড়তেই বোঝা গেল, ধর্মেন্দ্র নিজ কর্মে বলিউডের হি-ম্যান হতেই পারেন, কিন্তু মৃত্যুর পর পরিবার ঠিক করবে, সেই রাজার যাত্রা কতটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই হয়তো ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু ও শেষযাত্রা থেকে গেল জৌলুসহীন। ২৪ তারিখ বেলা বাড়তে সেই জৌলুসহীন শেষযাত্রায় একে একে হাজির হতে থাকেন বলিউডের সব তারকা। জানা গেল, দেওল পরিবারের পক্ষ থেকে ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সকলকেই মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। কিন্তু বেশি হইচই করতে বারণ করা হয়েছে। কারণ মিডিয়াকে দূরে রাখাটাই উদ্দেশ্য। অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, রণবীর সিংহ, দীপিকা পাড়ুকোন, রণবীর কপূর, আমির খান, আলিয়া ভট্টসহ বলিউডের প্রায় সকল তারকা এসে হাজির হন ধরমজির শেষকৃত্যে। কিন্তু সবটাই বড় নিঃশব্দে। শ্মশানের বাইরে তখন থিকথিক করছে মিডিয়ার ভিড়। সেই সব 'চক্ষুশূল'দের সরিয়ে ধর্মেন্দ্রর শববাহী গাড়ি এসে দাঁড়াল পবন হংসে। ঠিক পিছনের গাড়িতে মেয়ের সঙ্গে হেমা মালিনী। ক্যামেরা দেখেই করজোড়ে



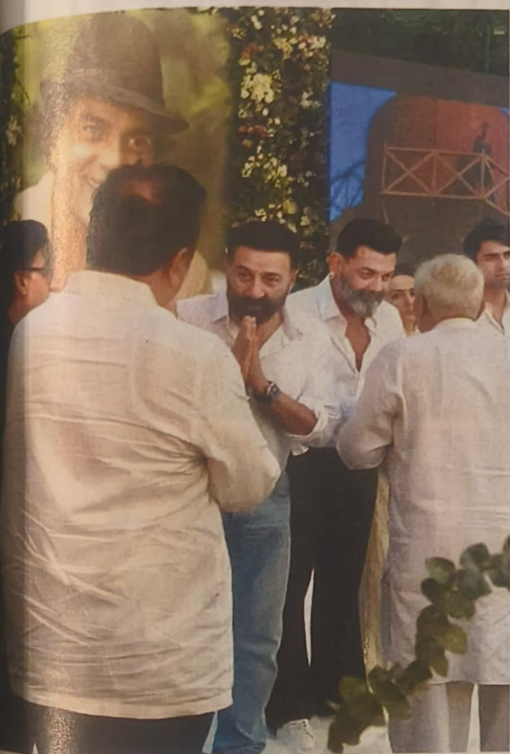
■ পাপারাৎজ্জি দেখে রাগে ফেটে পড়লেন সানি দেওল

বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করেন তাঁরা। ঘড়িতে তখন দুপুর ১ টা। দুপুর দুটো নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হতেই তারকাদের দেখা মিলল আবার। কিন্তু

এরকম সমাপ্তির কারণ? শুধু তো বিতর্ক নয়, এ যেন অনুরাগীদের চাপা অভিমানও।

শিরোনামে কী কী?

আসলে ধর্মেন্দ্রর প্রেম জীবন, সাংসারিক জীবন, সন্তানদের জীবন, ব্যক্তিগত আরও নানা বিষয় নিয়ে শুধুই তর্ক-বিতর্ক, মতবিরোধ চলেছে গত কয়েক দশক ধরে। সেসব আরও



প্রকাশ কৌর আয়োজিত প্রেয়ার্স মিটে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে সানি ও ববি

> সানির মেজাজ সপ্তমেই থাকে। এই যেমন বাবার অস্থি বিসর্জনের সময় ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোককে দেখে তিনি হঠাৎ আক্রমণাত্মক হয়ে বললেন...

বেশি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যায় ধর্মেন্দ্রর শেষবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর। মৃত্যুর দিন পনেরো আগে বার্ধক্যজনিত এবং শ্বাসকষ্টজনিত কারণ নিয়ে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। কিন্তু এবার অবস্থা ছিল অতিসঙ্কটজনক। বারবার মৃত্যুর খবর আসতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে।



ধর্মেন্দ্রর শেষ যাত্রায় পবন হংস শ্মশানের পথে আমির খান



খবর পেয়েই ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্যে যাচ্ছেন অভিষেক বচ্চন

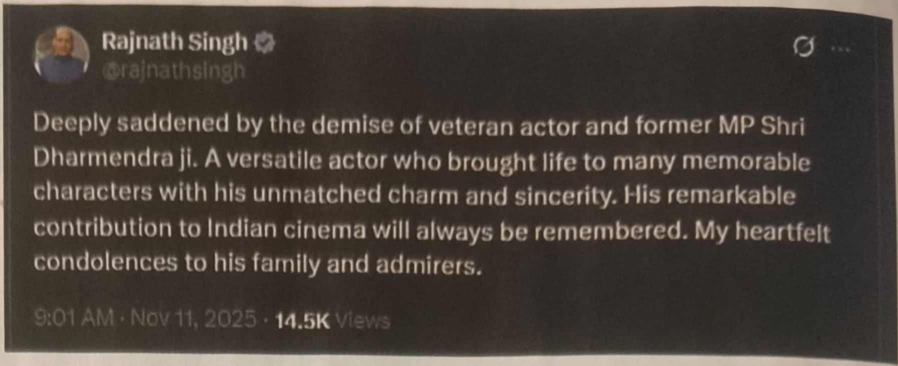


বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাতে যাচ্ছেন অমিতাভ, সঙ্গে রয়েছেন নাতি অগস্ত্য।

হাসপাতালে তখন নিত্য যাতায়াত দেওল পরিবারের সকলের। বাইরে পাপারাৎজ়ির ভিড়ও বাড়ছে। ফেক নিউজ়ে ততদিনে ভারাক্রান্ত পরিবার। হঠাৎ একদিন সকলের সামনে মেজাজ হারালেন সানি দেওল। ক্যামেরা হাতে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের গালিগালাজ করে বলেন, "লজ্জা করে না? বাড়িতে মা-বাবা নেই?" যদিও এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। সানির মেজাজ সবসময় সপ্তমেই থাকে। এই যেমন বাবার অস্থি বিসর্জনের সময়ও ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোককে দেখে তিনি হঠাৎ আক্রমণাত্মক হয়ে বলেন, "কত টাকা চাই তোর?" এ যাবৎ তাও ঠিক ছিল। কারণ পরিবারের



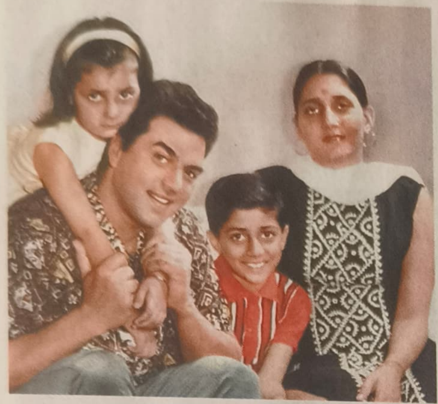
■ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র



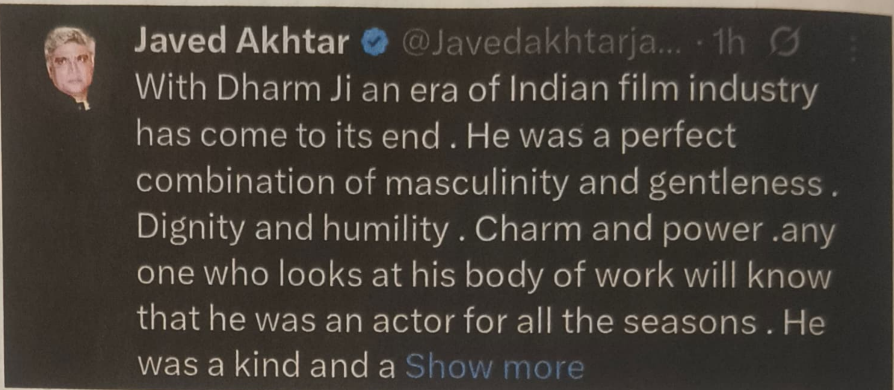
Rajnath Singh
@rajnathsingh

Deeply saddened by the demise of veteran actor and former MP Shri Dharmendra ji. A versatile actor who brought life to many memorable characters with his unmatched charm and sincerity. His remarkable contribution to Indian cinema will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and admirers.

9:01 AM · Nov 11, 2025 · 14.5K Views



■ প্রকাশ কৌর ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একফ্রেমে



Javed Akhtar @Javedakhtarja... · 1h

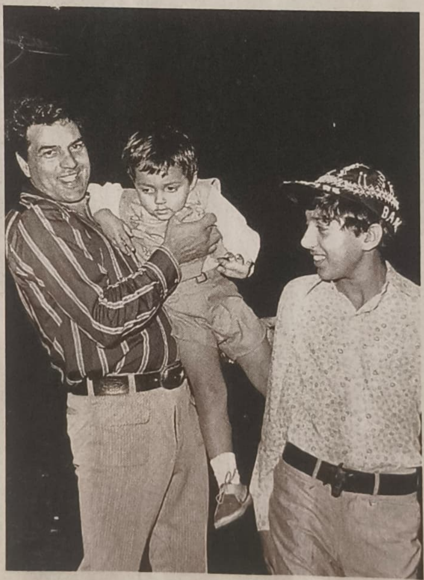
With Dharm Ji an era of Indian film industry has come to its end . He was a perfect combination of masculinity and gentleness . Dignity and humility . Charm and power .any one who looks at his body of work will know that he was an actor for all the seasons . He was a kind and a Show more

■ ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু নিয়ে রাজনাথ সিংহ এবং জাভেদ আখতারের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট। ধর্মেন্দ্র তখনও জীবিত

বিবৃতি ছাড়া নিশ্চিত করা যায় না কোনও কিছুই। অতীতে এমন অনেক তারকারই অতিসঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে থাকাকালীন মৃত্যুর গুজব রটে। কিছুটা গোপনে রাখা হয় মৃত্যুর কারণ। অপেক্ষা করা হয় পারিবারিক মতামতের জন্য। ঠিক যেমনটা হয়েছিল শ্রীদেবীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর অন্তিমযাত্রায় কোনও নিভৃত যাপন ছিল না। কিন্তু সকলের প্রিয় ধরমপাজির শেষযাত্রা অধরা রয়ে গেল অনেকের কাছেই।

গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তা

এখন মনে হয়, এই যাত্রায় হয়তো এতটাও গোপনীয়তা থাকত না। থাকত না শ্মশানের ভিআইপি গেটে অতিরিক্ত পুলিশ। যদি না সমাজের দায়িত্ববান ব্যক্তিরাও ভুল খবর ছড়াতেন। ধর্মেন্দ্র বেঁচে থাকাকালীনই তাঁর মৃত্যু সংবাদে সিলমোহর দেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং বর্ষীয়ান গীতিকার জাভেদ আখতার। সাধারণ মানুষ আর কী করবে! এমন পোস্ট দেখে তারাও সমাজ মাধ্যমে ধর্মেন্দ্রর ছবি দিয়ে 'আরআইপি' লিখতে থাকে। খবর করে বেশ কিছু জাতীয় সংবাদমাধ্যমও। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হেমা ও এষার পোস্ট নিশ্চিত করে, এ খবর সম্পূর্ণ ভুল। তার দু'দিন পরেই একটি লম্বা ভিডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে



■ সানি, ববি এবং ধর্মেন্দ্র

> পারিবারিক গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে ধর্মেন্দ্রর কেবিনের ভিডিয়ো করেন হাসপাতালেরই এক কর্মী। সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে ভুয়ো খবরের ঝড় বয়েছিল

আসে। পারিবারিক গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে হাসপাতালে ধর্মেন্দ্রর কেবিনের ভিডিয়ো করেন হাসপাতালেরই এক কর্মী। সেই ভিডিয়োয় সানি, ববিসহ পরিবারের সকল সদস্যকেই অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।

ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয় দেওল পরিবার। কিন্তু একই সঙ্গে বাড়তে থাকে তাঁদের অন্দরের চাপানউতোর।

অধরা পারিবারিক সমঝোতা

হাসপাতালের ওই ভিডিয়ো ক্লিপ আইনলঙ্ঘিত হলেও স্পষ্ট করে, হি-ম্যান প্রায় নেই। 'প্রায় নেই' কথাটাতেই ভর করে বাকি বন্দোবস্ত করে দেওল পরিবার। মৃতপ্রায় ধর্মেন্দ্রর পরিবারের সঙ্গে থাকা উচিত, এমনটাই মনস্থির করেন ধর্মেন্দ্রর অর্ধাঙ্গিনী প্রকাশ কৌর। বাড়িতেই রাতারাতি হাসপাতালের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বাড়ি গেলেন ধর্মেন্দ্র। তবে অচেতন হয়েই। আগের ঘটনাগুলো থেকে তখনও মন সরেনি কারও। তাই তিনি কেমন আছেন, কী পর্যায়ে রয়েছেন... সে সব জানার সৌভাগ্য হয়নি। ঠিক সেই সময় শোনা গেল, ধর্মেন্দ্রর ৯০ বছরের জন্মদিনের আয়োজন করছে পরিবার। বিবাদ যতই হোক, এক্ষেত্রে একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দুই পরিবার। কিন্তু তা আর হল না।

নিভৃতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ধর্মেন্দ্র। কখন? তারিখ জানলেও, তার সময় নিয়ে সন্দেহ এখনও রয়েছে।

বিবাদের বলি সম্পত্তি

তবে জন্মদিনে না হলেও, ধর্মেন্দ্রর স্মরণ সভায় এক হলেন সকলে। কিন্তু সত্যিই কি সকলে? না, সকলে নন। কারও মৃত্যু নিয়ে অযথা বিতর্ক তো তৈরি হয় না। তা স্পষ্ট হল এই প্রেয়ার্স মিটেই। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে দু'টি আলাদা স্মরণ সভার আয়োজন করা হল। একটির আয়োজক তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর, সানি, ববিসহ প্রথম পক্ষের সন্তানরা। মুম্বইয়ের তাজ ল্যান্ড এন্ডসে 'সেলিব্রেশন অফ লাইফ' নামক ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ, রেখা, শাহরুখ, সলমন, ঐশ্বর্যা, সোনু নিগম, সিদ্ধার্থ মলহোত্র প্রমুখ। কিন্তু সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে হেমা মালিনী ও তাঁর দুই কন্যার দেখা মেলেনি। এরপর বাড়িতেই আর একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হল। তবে সেটি



দুই মেয়ের সঙ্গে হেমা মালিনী

হেমা-ধর্মেন্দ্রর বাড়িতে। আয়োজক হেমা মালিনী ও তাঁর দুই কন্যা। খানিক ক্লোজ় ডোর প্রোগ্রাম বলা যেতে পারে এটাকে। দুই পক্ষের রেষারেষিও অনুভব করা যেতে পারে। যদিও এই স্মরণ সভায় শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও পরিবার উপস্থিত ছিল। আসলে বিরোধ তো শুরু থেকেই। অভিনেতা মারা যাওয়ার পর জানা যায়, তাঁর ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। প্রকাশ কৌরের উপস্থিতিতে দেওল পরিবারের কোনও সম্পত্তিতেই অধিকার নেই হেমা মালিনীর। আইনি জটিলতা তার নেপথ্যে। যদিও নিজের বাড়ি-ব্যবসার যথাযথ নিষ্পত্তি আগেভাগেই



ধর্মেন্দ্রকে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করছেন হেমা

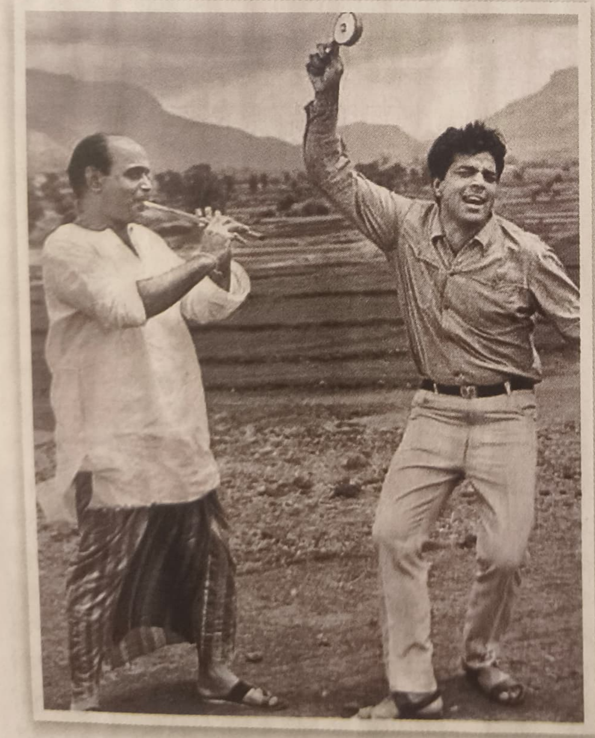
> ধর্মেন্দ্র নাকি কখনও 'হি ম্যান' তকমা ছেড়ে বেরোতে চাননি। চাননি অসুস্থ অবস্থায় প্রকাশ্যে আসতে। সর্বদা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন নিজের 'হিরো ইমেজ'

সেরে রেখেছিলেন দেওল সাম্রাজ্যের রাজা। ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে যথাযথভাবে তা ভাগও করে গিয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্জাবে যে বিপুল সম্পত্তি তাঁর ছিল, তা তিনি নিজের কোনও সন্তানকে দেননি। কাকার নাতি-নাতনিদের দান করেছেন। ধর্মেন্দ্রর বক্তব্য ছিল, ওই সম্পত্তি যাঁরা দেখভাল করছে, তাঁদেরকেই লিখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব তিক্ততা কি মৃত্যুকেও ছুঁয়ে যাবে? মৃতপ্রায় ধর্মেন্দ্রকে কেন বাড়িতে নিয়ে আসা হল, তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। ভাগ বাটোয়ারার সমাধান করতেই কি? সম্পত্তি, প্রতিপত্তির লোভ, খ্যাতির পাহাড়... এসব অনেক আগে থেকেই তারকাদের মৃত্যুর কারণ। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু স্বাভাবিক হলেও, শেষ কয়েকদিনে তাঁকে নিয়ে কম কাটাছেঁড়া হয়নি। ভিত্তিহীন মিথ্যে রটনা তো রয়েইছে, সঙ্গে রয়েছে পারিবারিক মতবিরোধও। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে, বলা ভাল শেষকৃত্যের অনেক পরে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ্যে আনেন পরিবারের সদস্যরা। কারণ? ধর্মেন্দ্র কখনও নিজের 'হি ম্যান' তকমা ছেড়ে বেরোতে চাননি। চাননি অসুস্থ অবস্থায় প্রকাশ্যে আসতে। বজায় রাখতে চেয়েছিলেন নিজের 'অ্যাকশন হিরো ইমেজ'। ফলে তাঁর কথাকেই সম্মান জানিয়েছে পরিবার। সাধারণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী ধর্মেন্দ্রর অন্তিম যাত্রাও সাধারণভাবেই হল। এবং মৃত্যু ঘিরে নানা গুজব তাকে আরও অন্তরালে নিয়ে গেল। ধর্মেন্দ্র শেষ সময়ে বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ দিনগুলোয় কতটা শান্তি বজায় ছিল, সেই নিয়ে বিতর্ক থাকবেই।

ছবির রাজা রাজার ছবি

বলিউডের অন্যতম সুপুরুষ অভিনেতা ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে সিনেমা করার জন্য, ছবি তোলার জন্য মুখিয়ে থাকতেন সকলে। ফলে সেই **ধর্মেন্দ্র**র ছবি অতুলনীয় হবে না তো কার হবে! তাঁর ছবি সেই কারণেই তো কথা বলে। তৈরি করে রূপকথা। এই প্রতিবেদনে আমরা ছবির কোলাজ তৈরি করলাম। শ্রদ্ধা জানালাম হি-ম্যানকে। ছবির মাধ্যমেই।





নাচের তালিম নিয়েছিলেন শুরু থেকেই। এবং তা ছিল সাবলীল



ছোট্ট ববি দেওলের সঙ্গে। দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন পিতা-পুত্রের



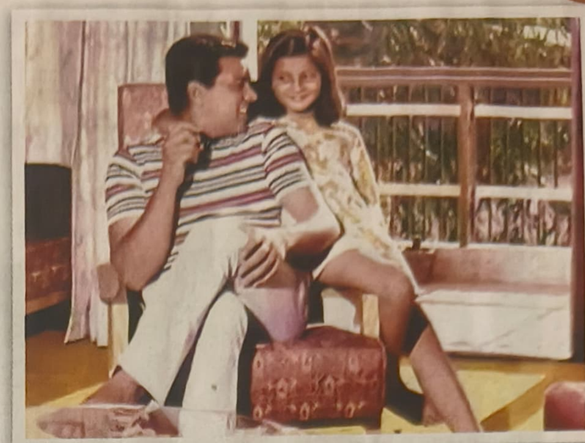
ঋষি কপূর এবং কিমি কাতকারের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র



পাটিতে মজা করতে পারতেন নিজের মতো করে



শুটিং করতে গিয়েও পুরোহিতের আশীর্বাদ নিতেন হেমা ও ধর্মেন্দ্র



কন্যা বিজেতার সঙ্গে পিতা ধর্মেন্দ্র



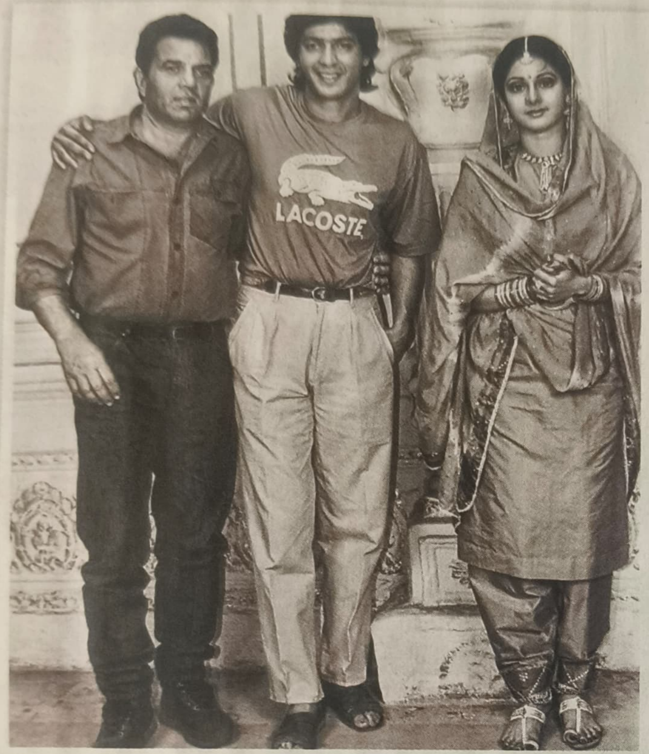
বিনোদ খন্নার সঙ্গে কি বন্ধুত্ব ছিল তাঁর?



জয়া প্রদার সঙ্গে আড্ডায়

'শোলে'র শুটিংয়ের সময় হেমা মালিনীর সঙ্গে প্রেম করার জন্য ধর্মেন্দ্র লাইট ম্যানকে ২০ টাকা করে দিতেন। যাতে, সেই কর্মী লাইটে বারবার ভুল করে এবং সেই শটের শুটিং বারবার হয়। দৃশ্যটি ছিল বাসন্তীকে বীরুর বন্দুক চালানো শেখানোর।

রেলের একজন সামান্য ক্লার্ক হিসেবে জীবনের প্রথম চাকরিটি পান ধর্মেন্দ্র। বেতন ছিল মাসে ১২৫ টাকা। যার প্রায় পুরোটাই তুলে দিতেন বাবার হাতে। সেখান থেকেই নিতেন হাতখরচ



চাঙ্কি পাণ্ডে ও শ্রীদেবীর প্রতি ছিলেন বিশেষ সহানুভূতিশীল

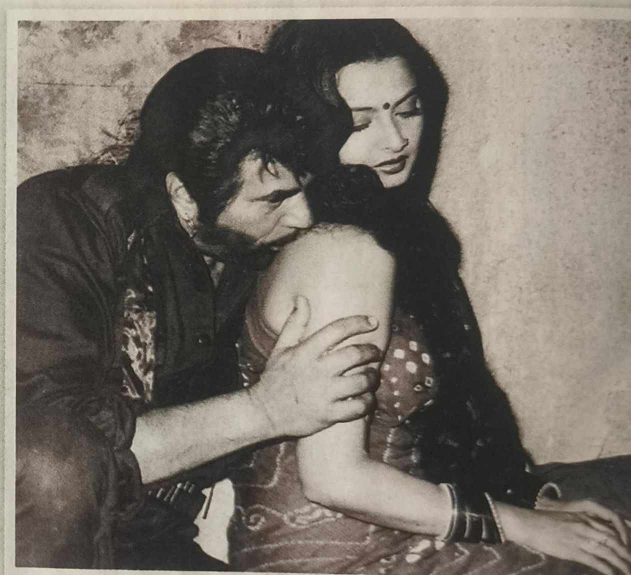


রমণীমোহন

সাতের দশকে ধর্মেন্দ্র বলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া নায়ক ছিলেন। প্রতি সিনেমায় তাঁর পারিশ্রমিক ১.৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকার মাত্রা পর্যন্ত ছুঁয়েছিল।



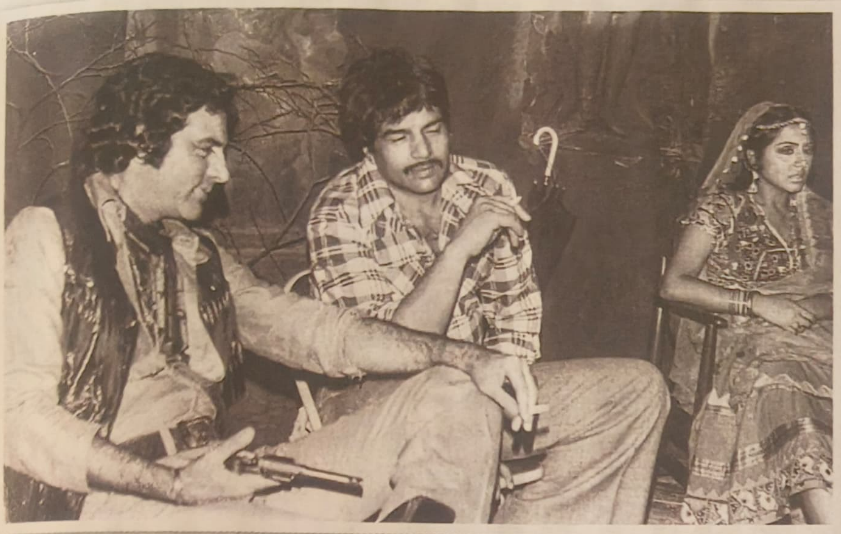
সুচিত্রা সেনের প্রেমে পড়েছিলেন কি?



রেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে



মেহমুদ ও ধর্মেন্দ্রর খুনসুটি



ফিরোজ় খানের সঙ্গে ছবির সেটে



মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও রাজেশ খন্নার সঙ্গে



সুচিত্রা সেন ও মীনা কুমারীর মাঝে



বাপি লাহিড়ী ছিলেন তাঁর পছন্দের মানুষ

ধর্মেন্দ্রর এক দাদা ছিলেন। নাম ছিল সন্তোষ। ধর্মেন্দ্রর ২ বছর বয়সে সেই দাদার মৃত্যু হয়।

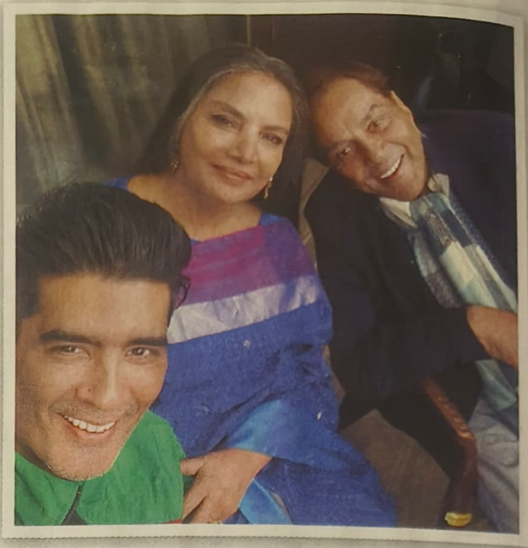


ছেলে সানি দেওলকে পাশে নিয়ে

নিজের বড় মেয়ে বিজেতার নামে প্রোডাকশন কোম্পানি খুলেছিলেন ধর্মেন্দ্র। আর সেই প্রযোজনা সংস্থার হয়ে বলিউডে তিনি লঞ্চ করেছিলেন নিজের বড় ছেলে সানি দেওলকে। ছবির নাম 'বেতাব'।



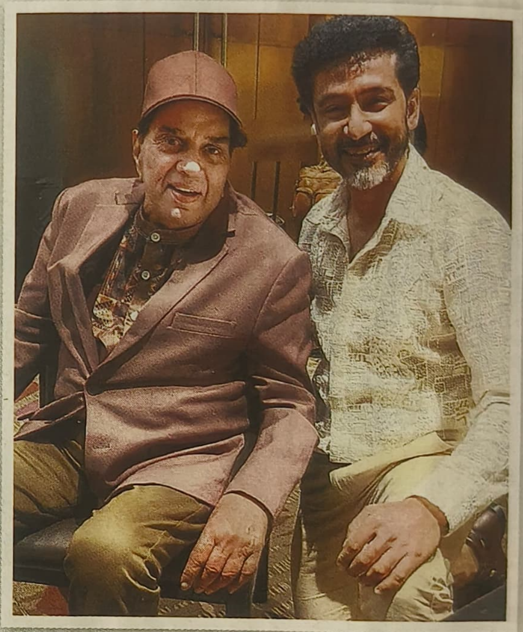
অমিতাভ বচ্চনকে নিজের পরিবারের অংশ বলে ভাবতেন তিনি



‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানী’র সেটে



শিল্পা শেট্টির সঙ্গে একটি রিয়েলিটি শোয়ের সেটে

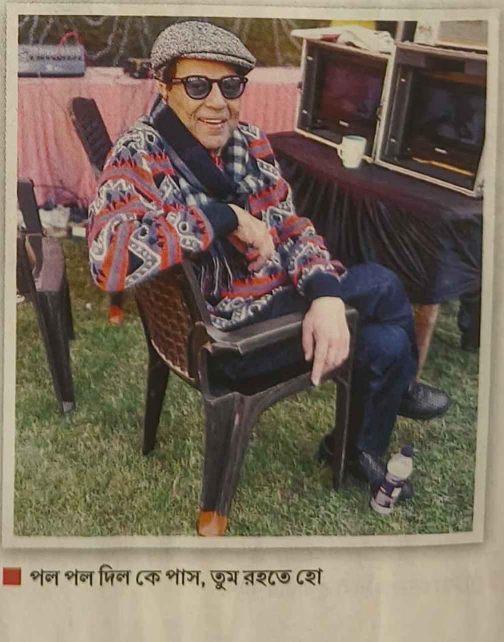


‘রকি আউর রানি...’র সেটে টোটা রায়চৌধুরীর সঙ্গে

বলিউড তাঁকে ‘হি ম্যান’ ছাড়াও যে নামে ডাকত, সেই ‘গরম ধরম’ নামে একটি রেস্তোরাঁ চেনও শুরু করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। সেই ধাবা এখনও অবস্থিত দিল্লি ও হরিয়ানায়।



শ্রীরাম রাঘবনের ছবি ‘ইক্কিস’-এ শেষবার দেখা যাবে তাঁকে



পল পল দিল কে পাস, তুম রহতে হো